সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ● দ্বিতীয় বর্ষ অষ্টম সংখ্যা ● ডিসেম্বর ২০১৫ ● পাঁচ টাকা

রোকেয়া স্মরণ

৯ ডিসেম্বর নারী জাগৃতির পথিকৃৎ মহিয়সী রোকেয়ার ১৩৫তম জন্ম ও ৮৩তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমাদের

শ্রদ্ধাঞ্জলী

"কেহ বলিতে পারে যে 'তুমি সামাজিক কথা বলিতে গিয়া ধর্ম লইয়া টানাটানি কর কেন?' তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, 'ধর্ম' শেষে আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে, ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন। তাই ধর্ম লইয়া টানাটানি করিতে বাধ্য হইলাম। এজন্য ধার্মিকগণ আমাকে ক্ষমা করিতে পারেন।"

"অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনী"। "প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহা গোলযোগ বাঁধাইবে, জানি; ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য "কৎল"-এর (অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের) বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি। (এবং ভগ্নীদিগের জাগিবারও ইচ্ছা নাই, জানি!) কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই। বলিয়াছিত, কোন ভাল কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও গ্যালিলিও বলিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাই হউক পৃথিবী ঘুরিতেছে। ... আমাদিগকেও ঐরূপ বিবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে।"

নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা

সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদই মানবমুক্তির পথ

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

[গত ৭ নভেম্বর ছিল মহান রুশ বিপ্লবের ৯৮তম বার্ষিকী এবং আমাদের দল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষে আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেটে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি পার্টি কনভেনশনে গৃহিত আন্তর্জাতিক থিসিসের ভিত্তিতে বর্তমান আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করেন। ঐ বক্তব্যগুলো সংকলন করে ও পরবর্তীতে কমরেড সাধারণ সম্পাদকের আরও কিছু সংযোজনীসহ এই বক্তব্যটি প্রকাশ করা হলো]

১৯৮০ সালের ৭ নভেম্বর মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে আমাদের দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কিছুদূর এগিয়েছিল। আমরা সেই আদর্শগত হাতিয়ার নিয়েই আমাদের দেশে একটা সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দল গড়ে তোলার সংগ্রাম করছিলাম। কিন্তু একসময় প্রতিষ্ঠাকালীন সেই ঘোষণা থেকে কেন্দ্রিয় নেতৃত্বের একটা অংশ সরে এলেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রব্যাপী মার্কসবাদ চর্চার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী দল গড়ে তোলা ও তার নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে সমাজের বিপ্লবী রূপান্তর ঘটানোর যে কষ্টকর সংগ্রাম – তা থেকে তারা সরে এলেন। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পথে পার্লামেন্টারি সুবিধাবাদী রাজনীতি শুরু করলেন। ফলে আমাদের নতুন করে শুরু করতে হলো। একটা দীর্ঘ সময় মতাদর্শিক লড়াইয়ের পর ২০১৩ সালের ৭ এপ্রিল থেকে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি) এই নামে আমরা চলতে থাকি এবং ২০১৪ সালের ২০ নভেম্বর কনভেনশনের মধ্য দিয়ে আমাদের দলের নাম বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ঘোষণা করি।

এ সবই আপনারা জানেন। আমাদের দলের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যই এই কথাগুলো বলা। যে কথাটা বলতে চাইছিলাম তা হলো, মার্কসবাদী বিপ্লবী রাজনীতির একটা বাস্তবতা এই যে, দুনিয়ার দেশে দেশে তাকে প্রতিবিপ্লবী চিন্তার মোকাবেলা করেই এগোতে হয়েছে। এই মহান সভ্যতা বিকাশের যে আন্দোলন অর্থাৎ বৈষম্যমূলক সামাজিক ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ সাম্যের সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা – তার লক্ষ্যে দেশে দেশে বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বেই গণআন্দোলনসমূহ গড়ে ওঠে। আবার সমাজের বিপ্লবী রূপান্তর ঘটানোর লক্ষ্যে গণআন্দোলনসমূহ গড়ে তোলা ও তাতে নেতৃত্ব করার জন্য যে বিপ্লবী পার্টি গড়ে ওঠে, দেশে দেশে গড়ে ওঠা সেই পার্টিগুলোর মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদী চিন্তা ও অকার্যকরী সংশোধনবাদী চিন্তা পাশাপাশি অবস্থান করে। কারণ বস্তুজগতের সবকিছুই পরস্পরবিরোধী উপাদান নিয়ে গঠিত। একটা সময় মানুষ যা জানে বস্তুর বিকাশের সাথে সাথে আরেকটা সময় তা অকার্যকরী হয়ে যায়। ফলে ক্রমবিকাশমান বস্তুজগতের বিকাশের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা, আদর্শ, *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

১৩ নভেম্বর ঢাকার তাজুল মিলনায়তনের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

বগুড়ায় শিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদে গুলিবর্ষণ-হত্যার নিন্দা ও বিচার দাবি

নিরাপত্তাহীনতা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ২৭ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বগুড়ার শিবগঞ্জে শিয়া মসজিদে নামাজরতদের ওপর বন্দুকধারী হামলাকারীদের গুলিতে মসজিদের মুয়াজ্জিন নিহত ও কয়েকজন আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং অবিলম্বে ঘাতকদের গ্রেপ্তার-বিচার দাবি করেছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, অগণতান্ত্রিক মহাজোট সরকারের গণবিরোধী শাসনে দেশে আজ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নেই। এই সুযোগে ইসলামী উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলো ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির বিস্তার ঘটাতে উঠে-পড়ে লেগেছে। এর প্রাথমিক শিকার হচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও ভিন্নমতাবলম্বীরা। এর আগেও ঢাকার হোসেনী দালানে শিয়া সম্প্রদায়ের ওপর বোমা হামলায় দুইজন নিহত হয়েছে, খ্রীস্টান ধর্মযাজক হত্যার চেষ্টা হয়েছে। গতকালই আবার রংপুর এলাকার পাদ্রীদের হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। গত কয়েকমাস ধরে ব্লগার-প্রকাশক হত্যা, মাজার ও সুফিপন্থীদের খুন করা, বিদেশি নাগরিক হত্যা ও পুলিশ খুন – ধারাবাহিক ও পরিকল্পিত এসব ঘটনার পরও সরকার এসবকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে দাবি করে এসেছে। আক্রান্তদের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব পালন না করে বরং এসব ঘটনা থেকে সরকার রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করেছে। সরকারের দায়িত্বহীনতা ও মৌলবাদী জঙ্গীগোষ্ঠীর বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সুযোগে বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদী নানা ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে, জনগণকেই আজ নিরাপত্তার দাবিতে, মৌলবাদী ধ্যান-ধারণা ও সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। একইসাথে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি – যারা সন্ত্রাসবাদকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগায় – তাদের অপতৎপরতা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

রামপালে বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিলের দাবিতে 'সুন্দরবন রক্ষা সংহতি দিবস' পালন বাম মোর্চার

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত 'সুন্দরবন রক্ষা' সংহতি সমাবেশে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বলেছেন, এই সরকারের হাতে এদেশের মানুষের জীবন থেকে সুন্দরবন তথা জাতীয় সম্পদ পর্যন্ত কোনো কিছুই আর নিরাপদ নয়। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সুন্দরবনের অদূরে রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প সুন্দরবনসহ সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের জন্য অচিরেই এক ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে। তারা বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনেক বিকল্প আছে, কিন্তু সুন্দরবনের কোনো বিকল্প নেই। চাপের মুখে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের অনকূলে ছাড়পত্র নেয়া হয়েছে। তারা প্রকল্পের সমুদয় কাজ স্থগিত করে প্রয়োজনে স্বাধীন সমীক্ষা কমিশন গঠনের আহ্বান জানান। দেশব্যাপী আহুত 'সুন্দরবন রক্ষা সংহতি' দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসাবে ৫ নভেম্বর বিকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাম মোর্চার সমন্বয়ক বিপ-বী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক এর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, অধ্যাপক আকমল হোসেন, প্রকৌশলী ম ইনামুল হক, ব্যারিস্টার জ্যোর্তিময় বড়ুয়া, সাংবাদিক আবু সাইদ খান, অধ্যাপক তানজিমউদ্দিন খান, শিল্পী-লেখক অরূপ রাহী, এড. হাসনাত কাইয়ুম, সংস্কৃতিকর্মী মফিজুর রহমান লাল্টু, গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, এড. আব্দুস সালাম, মোশাররফ হোসেন নান্নু, মোশরেফা মিশু, *(পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদই মানবমুক্তির একমাত্র পথ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) মূল্যবোধ সবকিছুই পরিবর্তিত হতে থাকে – নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে উন্নীত হতে থাকে। তখন পুরনো অকার্যকরী সংশোধনবাদী চিন্তার সাথে তার সংঘাত হয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আজকের যুগের সর্বোন্নত প্রকাশ ঘটেছে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায়। ১৯৮০ সালে যখন আমরা শুরু করেছিলাম তখন এই সত্যকে সামনে নিয়েই যাত্রা করেছিলাম। কিন্তু সত্যকে বুদ্ধি দিয়ে বোঝা আর যাচাই করার মধ্য দিয়ে বোঝার মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকে। নতুনতর উপলব্ধি ও পুরনো অভ্যাস-আচরণ পাশাপাশি চলতে থাকলে, নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পুরনো অভ্যাস না পাল্টালে উপলব্ধিও একদিন পাল্টে যেতে বাধ্য। কারণ পুরনো চিন্তা, পুরনো অভ্যাসের মধ্যেই অবস্থান করে। আমাদের দলেও তাই হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা ও অকার্যকরী চিন্তার এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে দুনিয়ার সকল বিপ্লবী পার্টিকেই যেতে হয়, আমাদেরও যেতে হয়েছে।

মানব ইতিহাসে রুশ বিপ্লবের ভূমিকা পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব যে সমাজের সবকিছুকে আবর্তিত করছে – এটা কার্ল মার্কস আবিষ্কার করলেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি মানব সমাজের অগ্রগতি কোন পথে হতে পারে, কোন শ্রেণীটি বিকাশমান, কোন শ্রেণীটি অবক্ষয়ী – সেটা মানুষের সামনে উপস্থিত করলেন। তিনি দেখালেন যে পুঁজিবাদ এমন একটি শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে যা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বন্ধন থেকে ছিন্ন হয়ে এক নতুন শক্তির জন্ম দিয়েছে এবং এই শ্রেণীটিই এখনকার সময়ের সামাজিক ব্যবস্থার সবকিছুকেই পরিচালনা করছে। তাদের শ্রমেই সবকিছু গড়ে উঠেছে এবং এটি ব্যক্তিগত শ্রম নয়, সামাজিক শ্রম। এই সামাজিক শ্রমই দুনিয়ার সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। এই শ্রমিকরা তাদের কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্য দিয়ে আদিম মধ্যযুগীয় সমাজ ভেঙ্গে আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর সমাজে রূপান্তর ঘটিয়েছে। এই শ্রেণীটি সর্বহারা শ্রেণী। তারা সমস্ত রকম সম্পত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সর্বহারা হয়েছে। এই শ্রেণীটি পুঁজিবাদী শোষণের ফলে ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে এবং এরা একমাত্র শ্রমকে কেন্দ্র করেই জীবন ধারণ করে।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় একদিকে শ্রমজীবীদের সংখ্যা বাড়ছে, আরেকদিকে আছে অল্পসংখ্যক লোক যারা পুঁজি খাটিয়ে মুনাফা অর্জন করছে। পুঁজিবাদী সমাজে এই দুটি শ্রেণীর স্পষ্ট মেরুকরণ ঘটছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কার্ল মার্কস সমাজের এই চিত্রটি তুলে ধরেন, এই সময়ে সমাজের বিকাশ কোন পথে হতে পারে তার নিয়মগুলি মানুষের সামনে রাখেন এবং কিভাবে দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য গড়ে উঠার মধ্য দিয়ে একদিন সমস্ত মানুষ সাম্যে যাবে তার দিক নির্দেশ করেন। এটি একটি ঐতিহাসিক নিয়ম। কল্পনা নয়, বাস্তব নিয়ম। মার্কস-এঙ্গেলস দুজনে মিলে মানব সমাজকে এই নতুন ধরনের বিজ্ঞানের ভিত্তি দিয়েছিলেন। এরপর দেশে দেশে তার অনুশীলন হয়। ১৯১৭ সালে, তখনকার সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের দুর্বল গ্রন্থি রুশদেশে, কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি বিপ্লব সম্পন্ন করে। লেনিন তখনকার সময়ে বুর্জোয়াদের যে পাণ্ডিত্য ও শিক্ষা, মার্কসবাদের উপর তাদের নানা আক্রমণ – ইত্যাদি মোকাবেলা করতে করতে বিশেষ দেশে, বিশেষ বিপ্লবের জন্য, বিশেষ পার্টির যে প্রয়োজনীয়তা তা নিয়ে আসেন এবং সেই বিশেষ পার্টির ঐতিহাসিক ভূমিকা কেমন হবে তা নির্দেশ করেন। এভাবে তিনি মার্কসবাদী বিপ্লবী রাজনীতি, যা মার্কস-এঙ্গেলস এনেছিলেন, তাকে আরও উন্নত ও বিকশিত করেন। এরই প্রায়োগিক দিক ছিল রুশ বিপ্লব। রুশ বিপ্লব মানব সমাজে শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীর মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হওয়া প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

রুশ বিপ্লব দুনিয়ার সামনে একটি নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসে তা হলো শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষরা, যারা পিছিয়ে পড়া, তারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে পারে এবং এটি দুনিয়ার দেশে দেশে মানুষের মুক্তির সংগ্রামে পথ নির্দেশক হিসেবে এসে যায়। এইভাবে সারা পৃথিবীতে তখন রুশ বিপ্লবের প্রভাব পড়তে থাকে। 'দুনিয়ার মজদুর, এক হও!' – এই স্লোগানকে সামনে রেখে তখন দেশে দেশে শ্রমিকরা এই বিপ্লবের জন্য কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের পাশাপাশি বিপ্লবীদের সমস্ত বিষয়কে মোকাবেলা করার জন্য যে জ্ঞান দরকার তার অভাবের সুযোগে বিপ্লববিরোধী শক্তি এর অভ্যন্তরে কাজ করতে থাকে। এটি হলো সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক শক্তি। এরা বুর্জোয়া শ্রেণী ও সর্বহারাদের মধ্যে আপোষকামী শক্তি। এরা নিজেদের সর্বহারা বলে পরিচয় দেয়, বাস্তবে বুর্জোয়াদের পক্ষেই কাজ করতে থাকে। শ্রমিকদের সুসংগঠিত আন্দোলনের মধ্যে তারা বিভ্রান্তি ও বিভ্রম নিয়ে আসে। সকল দেশেই এই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতিকে উন্মোচিত করতে করতেই সেই দেশের বুকে বিপ্লবী রাজনীতি মূর্তরূপে প্রকাশিত হয়। একাজটি লেনিন রুশদেশে করেছিলেন। লেনিনের এই শিক্ষার ভিত্তিতেই রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয় এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধি হতে থাকে। মহান লেনিনের মৃত্যুর পর সমাজতান্ত্রিক সমাজ লেনিনের শিক্ষা অনুসরণ করে বেশ খানিকটা সমাজতান্ত্রিক উন্নতির পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। জার্মানি ও ইতালিতে উগ্র জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয়। সে সময় জার্মানি ও ইতালি দুটোই সাম্রাজ্যবাদী দেশ। দু'দেশেরই বাজার দখল করার দরকার। কিন্তু তার কোনো বাস্তবতা তখন ছিল না। কারণ ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স – এ তিন দেশ তখন গোটা বিশ্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে ছিল। তারা বিশ্বের যে কোনো দেশে হস্তক্ষেপ করতো, কর্তৃত্ব করতো, কলোনি বানিয়ে শোষণ করতো। তখন জার্মানি ও ইতালির বড় কোনো কলোনি ছিল না। ফলে তাদের ছিল তীব্র বাজার সংকট। তাদের দেশে গড়ে ওঠা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পুঁজি খাটানোর আর কোনো জায়গা ছিল না। তাই বাজার দখল ছাড়া যখন তার বেঁচে থাকার আর কোনো উপায় নেই তখন সে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ আক্রমণ করতে লাগলো। নিজ নিজ দেশের জনগণের মধ্যে জাতীয় অপমান-অবমাননাবোধ কাজে লাগিয়ে অন্য রাষ্ট্রের উপরে আধিপত্যবাদী মনোভাব তাদের মধ্যে গড়ে তুললো। এই রাষ্ট্রসমূহের পরিচালকরা মানুষকে তাদের পেছনে জড়ো করার জন্য বিজ্ঞানের কারিগরি দিকটাকে গ্রহণ করলো, কিন্তু জনগণের চিন্তাকে পুরনো ধর্মীয় কুসংস্কার-কূপমণ্ডূকতায় আচ্ছন্ন করে রাখলো। উগ্র জাত্যাভিমান গড়ে তুলে এক দেশের জনগণকে অন্য দেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগিয়ে দিলো।

সোভিয়েত ইউনিয়ন জন্মের পর ছিল একা। তাই তখন আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি সে অর্জন না করতে পারলেও প্রতিবাদ করার শক্তি হিসেবে সে আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়েই দুনিয়ার দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠছিলো এবং তা ক্রমশই পরিণতির দিকে যাচ্ছিল। ভিয়েতনাম ও কোরিয়ায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই চলছিল। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে চলছিল ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াই। এমন সময়ে জার্মানি যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে তখন সোভিয়েত তার সমস্ত শক্তি দিয়ে বিরাট শিল্পোন্নত দেশ জার্মানীকে পিছু হটতে বাধ্য করে এবং এক সময় পরাজিত করে রাইখস্ট্যাগে লাল পতাকা উত্তোলন করে। যুদ্ধ পরবর্তীকালে চীন বিপ্লব সংগঠিত হয়। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো, যেগুলো প্রথম আক্রমণেই জার্মানির কর্তৃত্বে চলে এসেছিল, সেগুলোতে কমিউনিস্ট ও দেশপ্রেমিক জনতার ঐক্য শেষ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণতি পায়। তখন রাশিয়া, চীন, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, পূর্ব ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ – এই মিলে সমাজতান্ত্রিক শিবির গড়ে ওঠে। এই সময়ে মানুষ দেখলো মানব সভ্যতাকে রক্ষা করার এক বিরাট শক্তি, যার প্রকাশ ঘটিয়েছিলো রাশিয়া। আর তখন বিশ্বে সে একা নয়, একটা সমাজতান্ত্রিক শিবির সে গড়ে তুলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন যে কোনো দেশের উপর যখন ইচ্ছা হস্তক্ষেপ করতে পারতো, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অভ্যুত্থানের পর তা আর সম্ভব হলো না। নভেম্বর বিপ্লবের পথেই এই অভ্যুত্থান ঘটে।

আরেকটি ব্যাপার সে সময় ঘটেছিল। সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদীদের শাসিত উপনিবেশসমূহে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম শুরু হলো। যেহেতু সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উপস্থিতির কারণে চাইলেই সাম্রাজ্যবাদীরা এসব দেশে আগের মতো অত্যাচার-হত্যা-গণহত্যা চালিয়ে আন্দোলন দমন করতে পারেনা, তখন ঔপনিবেশিক দেশসমূহ তাদের শক্তিতেই একে একে মুক্ত হওয়া শুরু করলো। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হলো। এ কারণে রুশ বিপ্লব শোষিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা।

বাইরের শক্তি সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার পতন ঘটাতে পারেনি, ঘটিয়েছে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা

সেসময় একদিকে সমাজতান্ত্রিক শিবির সারা পৃথিবীর শোষিত-নিষ্পেষিত-পরাধীন মানুষের মুক্তির কাণ্ডারী, সারা দুনিয়ার মানুষের সামনে সে সাম্যের স্বপ্ন জাগিয়ে তুলেছিল, আবার একই সময়ে শোধনবাদী চিন্তা কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভ্যন্তরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। লেনিন এ সম্পর্কে কিছু হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। স্ট্যালিনও তাঁর জীবদ্দশায় শেষ কংগ্রেসে এই সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু এগুলো ছিলো ইঙ্গিত। এ সম্পর্কে সবচেয়ে সঠিক ও কার্যকরীভাবে বলেছেন এ যুগের অন্যতম মার্কসবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক, ভারতের এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ। ১৯৪৮ সালেই তিনি বলেছিলেন সাম্যবাদী শিবির আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করছে ঠিক; কিন্তু ভেতরে তাদের যে ঐক্য, যে সংহতি থাকা দরকার তা নেই; সমষ্টির স্বার্থের সাথে ব্যক্তি স্বার্থের যে বিরোধ – তাকে কিভাবে মীমাংসার দিকে নিয়ে যাবে, কোন নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে নিয়ে যাবে – এসব প্রশ্নে তাদের বিভ্রান্তি আছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বিশেষভাবে, কার্যকরী রূপে, কী ধরনের সমস্যার জন্য এরকম হচ্ছে – সেটা চিরে চিরে দেখিয়েছিলেন। এমনকি স্ট্যালিন জীবিতকালেও কমিউনিস্ট আন্দোলনে কী ধরনের দুর্বলতার সৃষ্টি হচ্ছে, সেটাও তিনি দেখিয়েছেন। 'সাম্যবাদী শিবিরের আত্মসমালোচনা' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন, দুনিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলন যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এখন আর আগের মতো সাম্রাজ্যবাদীরা যাকে ইচ্ছা তাকে আক্রমণ করতে পারে না। কিন্তু কমিউনিস্টদের উন্নততর চেতনা, মূল্যবোধ ও মার্কসবাদী রাজনীতি আরও সঠিকভাবে ধারণ করার ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা আছে। এগুলি বিপদ হিসেবে সামনের সময়ে আসবে। আর বাস্তব ইতিহাস হলো এই যে, সেই ত্রুটিগুলি না শোধরানোর কারণে একসময়ে দৃষ্টান্তমূলক শক্তি হিসেবে মানব সমাজের সামনে বহুরকম কার্য সম্পাদনকারী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের একসময় পতন ঘটলো।

কমরেড শিবদাস ঘোষ কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পরিবর্তে যান্ত্রিক সম্পর্কের যে প্রভাব তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। সেটি অনুধাবন করার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের মধ্যে যে অভিজ্ঞতার পার্থক্য আছে সেটাকে কেন্দ্র করে তাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বে উপনীত হতে হয়, ঐক্যে পৌঁছাতে হয় – তৎকালীন সময়ে তা ঘটেনি। ফলে পার্টিসমূহের মধ্যে যান্ত্রিক সম্পর্ক বিরাজমান ছিল। এই যান্ত্রিক সম্পর্ক আদর্শগত ক্ষেত্রে অনুন্নত অবস্থা তৈরি করে। কারণ এক সময়ের বড় আদর্শও যদি ক্রমাগত বিকশিত না করা হয় তবে এক সময় সে হয়ে পড়ে অকার্যকরী। কমিউনিস্ট দলসমূহ নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের প্রক্রিয়ায় আদর্শগত উন্নয়নের এ কাজটি তখন কার্যকরী ছিল না।

আবার সমস্ত বিশ্বেই ব্যক্তিবাদ তখন চূড়ান্ত রূপ নিচ্ছিল, তার প্রভাব সমাজতান্ত্রিক সমাজেও এসে পড়েছিল। সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের যে দ্বন্দ্ব – সেটির বাস্তবিক সমাধান কিভাবে হবে – কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব সে সম্পর্কিত কোনো পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারলেন না। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, সমাজতন্ত্র বাস্তবে এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে এসেছে যেটি সমষ্টিগত স্বার্থ অধিকার প্রতিষ্ঠার সামাজিক ব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তিগতভাবে চাইবার যে অধিকারবোধ সেটা বুর্জোয়া সমাজ থেকে পাওয়া। সমাজতন্ত্রে সে অধিকারের প্রশ্ন নেই। কারণ শ্রমজীবী মানুষই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মালিক। তাদের যদি কোনো অভাব থাকে তবে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে দক্ষতা-যোগ্যতা অর্জন করে সেই অভাব দূর করার সংগ্রাম করবে, ব্যক্তিগতভাবে কিছু চেয়ে সমাজের সাথে বিরোধ করার কোনো ব্যাপার নেই, কারণ তার কোনো ভিত্তিই সে সমাজে নেই। পুঁজিবাদী সমাজে যেমন পুঁজিপতি শ্রেণী বেশিরভাগ মানুষকে ঠকিয়ে সমস্ত অধিকার একাই ভোগ করে, তার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর ব্যক্তিগত অধিকারের দাবি তুলতে হয়, তার কোনো অস্তিত্বই সমাজতান্ত্রিক সমাজে নেই। পুঁজিবাদী সমাজের বঞ্চনার কোনো ভিত্তিই সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিরাজ করেনা। ফলে সেখানে রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির অধিকার নিয়ে কোনো লড়াই থাকতে পারেনা।

সমাজতন্ত্রে প্রত্যেক মানুষের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ এবং তার ভিত্তিতে পারিশ্রমিক দেয়া – সেটা হয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী সমাজের দিতে না পারার সীমাবদ্ধতা সেটা সাজতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি করা নয়, সেই অভাব সে অতীত সমাজ থেকে নিয়ে এসেছে। কারণ সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এ ব্যবস্থায় সামাজিক কোনো বাধা নেই ব্যক্তিগত অধিকারের। শুধু ব্যক্তি যা চায় তা দেয়ার মতো সক্ষমতা সামাজিকভাবে তৈরি হয়নি, এই পার্থক্য। তাই ব্যক্তির প্রয়োজন মতো সমাজের দেয়ার যে ক্ষমতা – যৌথভাবে, ক্রমাগত সংগ্রাম করতে করতেই তা অর্জিত হতে পারে। এই অভাব যখন সামাজিকভাবে দূর হবে, তখন ব্যক্তিগতভাবেও ব্যক্তি সে অভাব থেকে মুক্ত হবে। আবার এ কথাও ঠিক যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পার্থক্যসমূহ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিসত্ত্বা ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্বও থাকবে। এ দ্বন্দ্বের মীমাংসা কিভাবে হবে? মানুষের ন্যায়-নীতি, মূল্যবোধ, সংস্কৃতির উচ্চতর সংগ্রাম এর মধ্য দিয়ে তাদের চেতনাকে এমন উন্নত স্তরে তুলতে হবে যাতে সে বুঝতে পারে, ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু অভাব তার আছে তা দেয়ার ক্ষমতা সমাজের যে নেই সেটা কোনো বিপরীত শ্রেণীর শোষণের জন্য নয়। সেজন্য প্রতিটি মানুষকে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। যোগ্যতা অনুযায়ী সে সমাজের কাছ থেকে পাবে। আর নৈতিকভাবে সে সামাজিক স্বার্থের সাথে অভিন্ন হওয়ার সংগ্রামে যুক্ত থাকবে। এইভাবে বৈষয়িয়কভাবে সমাজের যে দেয়ার ক্ষমতা সেটা ক্রমাগত বিকশিত হতে হতে মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী দেয়ার ক্ষমতা সে অর্জন করবে। আবার মানুষের মননশীলতাও সেই স্তরে উন্নীত হবে যে, সে বুঝতে পারবে, সামাজিক স্বার্থের ব্যক্তিস্বার্থকে একীভূত করার মধ্য দিয়েই ব্যক্তির মুক্তি সম্ভব। কিন্তু তখনকার সময়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্বে থাকা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ তা বুঝতে পারলেন না। এই দ্বন্দ্বের প্রকৃতিই তারা ধরতে পারলেন না। তখন যেভাবেই হোক উৎপাদন বাড়াবার ঝোঁকে তারা শ্রমিকদের ইনসেনটিভ দেয়া শুরু করলেন। পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই বিপজ্জনক জিনিসকে ক্রুশ্চেভ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্যে নিয়ে এলেন।

স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভ সোভিয়েতের নেতৃত্বে এলেন। তিনি এসেই ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে লড়াই করার নামে ব্যক্তি স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত করা শুরু করলেন। স্ট্যালিন এমন একটি নাম, যে নামের সাথে সমাজতন্ত্রের এক মহিমাময় যুগের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে লেনিনের চিন্তার যে কার্যকারিতা, তার সবচেয়ে উন্নত উপলব্ধি ছিল স্ট্যালিনের মধ্যে। স্ট্যালিনের নেতৃত্বকে কেন্দ্র করেই দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলনগুলো গড়ে উঠেছিল। তার মর্মে আঘাত করে স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত করার মধ্য দিয়ে তারা লেনিনবাদের প্রকৃত উপলব্ধিরই গণ্ডগোল করে দিলেন। ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে অথরিটিকেই অস্বীকার করে বসলেন এবং সংশোধনবাদ প্রবেশ করার দ্বার উন্মোচন করে দিলেন। স্ট্যালিনের বিরাট ভূমিকা সারা বিশ্বের বিপ্লবী সংগ্রামকে যেমন উদ্বুদ্ধ করছিল, তেমনি অন্ধতাও তার মধ্যে জড়িয়ে ছিল। অর্থাৎ তাঁকে মানার মধ্যেই এক ধরনের অন্ধতা ছিল, সেটা তাঁর জীবিতকালেই ঘটেছিল, যেটি তাঁর বিরাট ঐতিহাসিক ভূমিকাকে ঠিক ঠিকভাবে বোঝার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করে। বিপ্লবী সংগ্রামে লেনিনের চিন্তাকে স্ট্যালিন যেভাবে ধারণ করতেন, তার পারসনিফিকেশন তিনি যেভাবে ঘটিয়েছিলেন স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর তা ধসে পড়লো মানেই হলো স্ট্যালিন যেভাবে লেনিনকে ধারণ করতেন, যৌথভাবে তা ধারণ করার মতো সংগ্রাম দলের অভ্যন্তরে হয়নি। সে সংগ্রাম অনেকখানি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। চিন্তার এই অনুন্নত মানকে কেন্দ্র করে ক্রুশ্চেভের মতো টেকনোক্র্যাট, বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ লোক নেতৃত্বে এসে গেলেন। স্ট্যালিন যে নিজে ব্যক্তিগতভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাথে অভিন্ন ছিলেন, ব্যক্তি স্ট্যালিন ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে যে কোনোও ফাঁক ছিল না, এটি তখন তত্ত্বগতভাবেও আসেনি। অর্থাৎ কমরেড শিবদাস ঘোষ যেভাবে যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত রূপ হিসেবে ব্যক্তি নেতৃত্বের আবির্ভাবের কথা বলেছেন, সেভাবে বিষয়টি আসেনি। সে কারণে স্ট্যালিনকে মেনেছে অন্ধভাবে, বাতিল করেছেও অন্ধভাবে। এ পুরো কাজটিই হলো ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে। একদিকে দলের মধ্যে যান্ত্রিক চিন্তার প্রভাব, অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদকে মোকাবেলা করার জন্য বিরাট আত্মত্যাগ, অনেক নেতা-কর্মীর মৃত্যু – এই সুযোগে ক্রুশ্চেভ পার্টির নেতৃত্বে চলে এলেন। ক্রুশ্চেভ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত করার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে স্ট্যালিনের অথরিটিকেই ধ্বংস করে দিলেন।

এই প্রক্রিয়ায় সংশোধনবাদ সোভিয়েতের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করলো। এই মহাশক্তিকে সাম্রাজ্যবাদীরা আক্রমণ করে হারাতে পারেনি। ভেতরের দুর্বলতার কারণে তার পতন ঘটলো। কেউ কেউ বলবেন হেরে গেলো। হেরে যায়নি, ভেতরের দুর্বলতার কারণে পর্যুদস্ত হয়েছিল। বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রই বুঝতে পারবেন, যে সমাজ মানুষের সামনে এগোবার ইতিহাস রচনাকারী, একেবারে নতুন সমাজব্যবস্থা হিসেবে যেহেতু সেটি দুনিয়ায় এসেছিল, তাকে ধারণ করার অভিজ্ঞতাজনিত ঘাটতির জন্য সে টিকে থাকতে পারলো না। এভাবে সভ্যতার প্রতি ক্ষেত্রে নানারকম সংকট কাটিয়ে কাটিয়েই একটি নতুন সমাজব্যবস্থা স্থাপিত হয়। এটিই সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়া। অনেক ক্ষেত্রে সামনে এগোবার রাস্তায় প্রবল বাধা থাকে। তখন মানুষ এক পা পিছিয়ে আবার এগোতে থাকে। তাই *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

মহান নভেম্বর বিপ্লব প্রমাণ করেছে অজ্ঞ, নিরন্ন মজুর-চাষির সংঘবদ্ধ শক্তি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করতে পারে

কমরেড শিবদাস ঘোষ

... নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বহু শিক্ষা রয়েছে। আমাদের বুঝতে হবে, আন্দোলনের মূল রাজনৈতিক লাইন সঠিক না হলে হাজার লড়ালড়ির মধ্যেও যেমন অতীতে হয়েছে, তেমনি ভবিষ্যতেও শোষিত মানুষের মুক্তি আন্দোলনগুলি বারবার ব্যর্থ হবে। যাঁরা বলেন, বিপ্লবের শক্তি এদেশে নেই, বিপ্লব করবার মনপ্রাণ বা তেজ এদেশে নেই, এদেশের যুবকরা প্রাণ দিতে জানে না, লড়তে জানে না, এদেশের চাষি-মজুর লড়তে এবং লড়াইয়ে সর্বস্ব দিতে জানে না–তাঁরা ইতিহাসকে অস্বীকার করেন। একথা সত্য নয়। এদেশের চাষি-মজুর, খেটে খাওয়া মানুষ, অগণিত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা এবং যুবকরা বারবার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। 'অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে, বিপ্লব করতে হবে' – শুধু এই স্লোগানটা কেউ যদি তুলে দিতে পেরেছে সময়মতো এবং তাদের শক্তি থেকেছে খানিকটা এই সমস্ত কর্মকান্ড গড়ে তোলবার, তাহলে বারবার দেশে দেখেছি লড়াইয়ের বন্যা এসেছে। শুধু 'বিপ্লব করতে হবে' – এই একটা কাল্পনিক ধারণাকে নিয়ে, শুধু এইটুকুকে সম্বল করে যুবকরা বারবার ময়দানে এসেছে, প্রাণ দিয়েছে, লড়েছে। কী বিপ্লব, কোথায় বিপ্লব, কীভাবে হবে, কার নেতৃত্বে হবে, রাস্তা কী – এতসব কিছু নিয়ে তারা মাথাই ঘামায়নি।

কাজেই লড়তে চায় না আমাদের দেশের ছেলেরা, লড়তে চায় না চাষি-মজুররা – তারা রাশিয়ার শ্রমিকদের মতো, চীনের শ্রমিক-চাষির মতো, ভিয়েতনামের চাষিদের মতো লড়াকু নয়, মরণপণ করে তারা বিপ্লব করতে পারে না, কেউ যদি তাদের জন্য ফাঁকিতে বিপ্লব করে দেয় তাহলে তারা বিপ্লবটা চায়, নাহলে তারা স্বভাবতই শান্তিপ্রিয়, তারা এত ঝঞ্ঝাট এবং লড়াই করতে চায় না – এসব কথাও ঠিক নয়। আসল গন্ডগোল হচ্ছে অন্য জায়গায়। আসল গণ্ডগোলটা হচ্ছে তারা পথ পায়নি, তাদের রাস্তা ঠিক হয়নি। আর রাস্তা যদি ঠিক না হয় – আন্দোলনের কলাকৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে, আন্দোলনের লক্ষ্য স্থির করার ব্যাপারে, বিপ্লবের স্তর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যদি ধারণা সঠিক না থাকে – অর্থাৎ আন্দোলনের মূল রাজনৈতিক লাইন এবং উদ্দেশ্য যদি ভ্রান্ত হয় তাহলে লড়াই করবার যত তেজ এবং কোরবানি করবার যত শক্তিই মানুষের থাকুক, সমস্ত আত্মত্যাগ এবং কোরবানি বিফলে যায়। শুধু কি এই আত্মত্যাগ এবং কোরবানি তখনকারমতই বিফলে যায়? না, এই বিফলতাকে কেন্দ্র করে নিরাশা এবং হতাশা জনমনকে ছেয়ে ফেলে। লড়াই এবং আন্দোলন করা সম্পর্কেই তাদের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। তারা ভাবতে থাকে, 'এই তো লড়লাম। এত প্রাণ দিলাম, এত ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করলাম। কিন্তু তাতে কী হল?' বামপন্থী কর্মীদের প্রশ্ন করতে শুরু করে, 'আন্দোলনে তো আমরা সমর্থন দিয়েছিলাম, কিন্তু কিছুই তো হল না। এদেশে কিছু হবে না। ও আপনাদের সকলকে দেখা গেছে, আপনারা সব দল সমান। কোনও পার্টিকে দিয়ে কিছু হবে না।' এইরকম সব মনোভাবনা আন্দোলনের বিফলতাকে কেন্দ্র করে তাদের মনকে ছেয়ে ফেলতে থাকে।

এমনকী এর দ্বারা একটা সাধারণ কথা পর্যন্ত তারা গোলমাল করে ফেলে – যেটা বর্তমানে খুব প্রবল। এবিষয়টা আমি একটু বলে নিতে চাই। তাদের কথায় আমি নাহয় ধরেই নিলাম যে, আমাদের কারওর দ্বারাই কিছু হবে না। কিন্তু হবে না বলে কী করবেন? আমাদের সকলকে দেখে নেওয়া হয়েছে বলে কি এইভাবেই তাদের জীবনযাপন করা চলবে? না, চলতে পারবে? পেট মানবে? জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, চাকরির স্থিরতা নেই, জমি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, বেকার সমস্যা বাড়ছে, পরিবার ভাঙছে, সংসারে শান্তি নেই, স্নেহ-প্রীতি-মমতা সব উবে যাচ্ছে, চোখের সামনে ছেলেপিলেগুলো দিনের পর দিন অমানুষ হয়ে যাচ্ছে, নিজেরাও অমানুষ হয়ে যাচ্ছেন এবং তা যে যাচ্ছেন তাও তাঁরা নিজেরা টের পাচ্ছেন – তাহলে চলবে এভাবে? না, এভাবে বেশিদিন চলে না। তাই কী দেখা যায়?

মাঝে মাঝে তাদের সুপ্ত মনুষ্যত্ব জেগে ওঠে। আর মনুষ্যত্বে খেয়াল যদি কেউ নাও করে পেটের খেয়াল, দেহের খেয়াল তাদের করতেই হয়। কারণ পেট বড় বালাই। বুদ্ধি না থাকলে, রুচি-সংস্কৃতির পর্দা উঁচু না থাকলে মনুষ্যত্বের খেয়াল হয়তো অনেকেই করেন না। কিন্তু পেটের খেয়াল সকলকেই করতে হয়। ফলে মার খেয়ে আবার তাঁদের উঠে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে তখন আবার পাগলের মতন, না হয় বাচ্চা ছেলের মতন হাত পা ছোঁড়েন। কারণ আন্দোলনগুলোর সামনে প্রয়োজনীয় সংগঠন কোথায়? সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব কোথায়? এইভাবে পাঁচ বছর, সাত বছর, আট বছর, দশ বছর বাদে-বাদেই দেশে এক-একটা লড়াইয়ের ঢেউ আসছে। আর প্রত্যেকটি লড়াইয়ে পরাজয়ের পর তাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে হতাশা। মনে হচ্ছে কিছুই হবে না। সেই মানুষগুলোই কিছুদিন বাদে অস্থির হয়ে আবার একটা কিছু করার জন্য চারিদিক থেকে শোরগোল শুরু করেন। তাহলে লড়াই দরকার এবং লড়াইয়ের ময়দানে তাঁদের আসতেও হবে। আজ না এলে দু'বছর বাদে আসতে হবে, দু'বছর বাদে না এলে পাঁচ বছর বাদে আসতে হবে। কিন্তু এসে আবার সেই বাচ্চা ছেলের মতো তাঁরা লাফাবেন, যে কোনও একটা স্লোগান আওড়াতে আওড়াতে তাঁরা মনে করবেন বিপ্লব করছেন এবং তার জন্য প্রাণ দেবেন। আবার মার খাবেন। আবার বিপথগামী হবেন। তাই প্রতিটি আন্দোলনের সামনে নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই মূল শিক্ষাটাকে আমাদের মনে রাখতে হবে। ...

... আদর্শ এবং রাজনৈতিক লাইন ভুল হলে কোনও একসময়ে যদি কেউ প্রচুর শক্তির অধিকারীও হয় শেষপর্যন্ত সেই শক্তি তার থাকবে না। এই 'আদর্শ' কথাটা আবার অনেক ব্যাপ্ত। আন্দোলনের নীতি-নৈতিকতা, রুচি-সংস্কৃতি সমস্ত প্রশ্ন এই আদর্শ কথাটার মধ্যে জড়িয়ে আছে। আমাদের দেশের আন্দোলনের মধ্যে এই যে একটা ধারা চলেছে – আমরা লড়ব, স্লোগান দেব – কিন্তু আমাদের মুখে কোনও লাগামের দরকার নেই, রুচি-সংস্কৃতির দরকার নেই, শালীনতার সঙ্গে, ভদ্র আচার-আচরণের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্কের দরকার নেই – এটা মারাত্মক ক্ষতি করছে। আন্দোলনের মধ্যে যাঁরা এ ধরণের আচরণ করছেন তাঁরা মনে করছেন, আমাদের যেমন খুশি আমরা কথা বলব, বয়স্ক মানুষকে যেমন মনে করব গালাগালি করব, তাদের সঙ্গে যে কোনও ভাষায় কথা বলব, স্লোগান দিতে দিতে কোমর দুলিয়ে যা হয় অঙ্গ ভঙ্গি করব, – কিন্তু স্লোগানটা যখন বিপ্লবেরই দিচ্ছি তখন বিপ্লবটা হয়ে যাবে। তাদের মনে রাখা দরকার যে, তা হয় না, হতে পারে না। মানুষ খেতে পাচ্ছে না বলে স্লোগান দেখে হয়তো আন্দোলনে খানিকটা আসে, কিন্তু কোমর দোলা দেখে আতঙ্কিত হয়। আন্দোলনের কর্মীদের অশ্লীল কথাবার্তা শুনে আতঙ্কিত হয়। তাদের স্বার্থপরতা দেখে তাঁরা কুকঁড়ে যায়। ফলে তাদের মধ্যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই অবিশ্বাস এবং সংশয় দেখা দেয়।

... আজ অবস্থা যতই খারাপ হোক, একটা কথা আপনাদের সবসময় মনে রাখতে হবে – যে কথাটা বুদ্ধিমান লোকদের, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদীদের বা বিজ্ঞান সাধকদের কেবলমাত্র জানা ছিল এবং মানুষ যুক্তি দিয়ে বুঝলেও মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারত না। তারা ভাবত, প্রতিক্রিয়াশীলদের ,বুর্জোয়াদের এই যে জগদ্দল পাথরের মতো বিরাট রাষ্ট্রশক্তি – যার এত মিলিটারি, এত ক্ষমতা, এত টাকা-পয়সা – তার বিরুদ্ধে কি নিরন্ন, অজ্ঞ, নিরক্ষর জনসাধারণ কখনও সংঘবদ্ধ হয়ে এমন রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে পারে বা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব, যার ফলে সেই শক্তি ভেঙে পড়বে এবং বিপ্লব সফল হবে? নভেম্বর বিপ্লব দুনিয়ায় প্রথম এই কথাটাকে আর তত্ত্বে না বুঝিয়ে বাস্তবে প্রমাণ করে দিয়ে গেল – হ্যাঁ সম্ভব।

... রাশিয়ার অজ্ঞ মজুর-চাষি বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করে একদল আমলাকেও তাদের অধীনে আনতে সক্ষম হল। কারণ তাদের বিপ্লবটা ভোটের মারফত ক্ষমতা দখল ছিল না, বা শুধু মিটিং-প্রসেশন করে কিছু লাঠালাঠি করা বা ঢিল-পাটকেল ছোঁড়াও ছিল না। তাদের বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল একটা বিরাট কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জনতার রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুত্থান ঘটানোর মাধ্যমে। এই রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুত্থান কথাটার মানে হচ্ছে, কমিটিগুলো গঠন করে সংগঠিতভাবে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে অজ্ঞ মজুর-চাষি লেখাপড়া না জানলেও অনেক কর্মক্ষমতা ও সংগঠন প্রতিভা – অর্থাৎ সংগঠন চালানো, নানা দিকে নজর নেওয়া প্রভৃতি বহু গুণের অধিকারী হয়ে স্তরে স্তরে গড়ে ওঠা। কাজেই বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনতার রাজনৈতিক শক্তির জন্ম হয় এবং সেই শক্তি পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থার দায়িত্ব নিতে পারে। ফলে মজুর-চাষি রাষ্ট্রক্ষমতা চালাতে পারবে না – এই ধারণাটাও যে ভ্রান্ত, নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তা প্রমাণ হয়ে গেল। হয়ে যাওয়ার পর এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ইউরোপের, চীনের, ভিয়েতনামের মজুর-চাষিরা নিজেদের রাজত্ব কায়েম করার জন্য এগিয়ে চলল।

নভেম্বর বিপ্লবের এই শিক্ষাগুলো মনে রাখার সঙ্গে সঙ্গে যে কথাটা আপনাদের মনে রাখতে হবে, তা হচ্ছে, বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বুর্জোয়ারা শক্তিশালী বলে, তাদের হাতে প্রবল রাষ্ট্রক্ষমতা রয়েছে বলে চিরকাল তারা জগদ্দল পাথরের মতনই আমাদের ঘাড়ের উপর বসে থাকবে – এমন ঘটলে বুর্জোয়াদের হয়ত ভালো হত এবং এ ভেবে তারা খুশিও হতে পারে, কিন্তু এরকম ঘটে না। তবে এই পরিবর্তন কতদিনে ঘটবে, এটা নির্ভর করছে আপনাদের উপর। যথার্থ বিপ্লবী আদর্শ এবং লাইন গ্রহণ করে, যথার্থ বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে স্তরে স্তরে গণআন্দোলনগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালনার মারফত জনগণের রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুত্থান, অর্থাৎ সোভিয়েটের মতন বিপ্লবী কাউন্সিল এবং গণকমিটিগুলো গড়ে তুলতে কতদিন আপনারা নেবেন তার ওপর নির্ভর করছে কত তাড়াতাড়ি বিপ্লব হবে। আপনারা মনে রাখবেন, এ কাজ ফাঁকি দিয়ে হবে না, মাঠে-ঘাটে শুধু চিৎকার করেও হবে না বা ভোটের বাক্সে কেরামতি-কারসাজি দেখিয়েও হবে না। বিপ্লব তখনই করতে আপনারা সক্ষম হবেন যখন সঠিক মূল বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইন ও আদর্শের ভিত্তিতে এবং সঠিক বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে জনতার নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তির জন্ম আপনারা দিতে পারবেন। ভোটেও যে আপনারা লড়েন এবং অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন যেগুলো আপনারা গড়ে তোলেন – সেগুলোকেও এই অর্থে লড়াই হিসাবে যদি আপনারা দেখেন এবং মূল বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক অর্থে সেগুলোকে গড়ে তুলতে পারেন – তবেই মনে রাখবেন, এগুলোর সার্থকতা আছে। তাছাড়া এক ইঞ্চিও বেশি এর কার্যকারিতা নেই। আর, এইটা যদি আপনারা ধরতে সক্ষম হন তাহলে সাথে সাথে এটাও আপনাদের বুঝতে হবে, যে গণআন্দোলনগুলো আপনারা গড়ে তুলছেন এর আগে যাওয়া আছে, পিছু হঠা আছে, জয় আছে, পরাজয় আছে, মার খাওয়া আছে – কারণ এর আঁকাবাঁকা পথ আছে। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, এই গণআন্দোলনগুলোর আদর্শ, নীতি, মূল রাজনৈতিক লাইন, বিপ্লবের রাজনৈতিক লাইন, বিপ্লবের স্তর নির্ণয় আপনারা ঠিক করেছেন কিনা – অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীদের জায়গায় বুর্জোয়াশ্রেণি যে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন এবং এই বুর্জোয়াশ্রেণিকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করাই যে বিপ্লবের প্রধান কার্যক্রম – এটা আপনারা ধরতে সক্ষম হয়েছেন কিনা।

... আমি আগেই বলেছি, আমাদের দেশে সামন্ততান্ত্রিক আর্থিক সম্পর্ক বা উৎপাদন সম্পর্ক বলতে কিছুই নেই – যা আছে তা সামন্ততন্ত্রের অবশিষ্টাংশ হিসাবে বর্তমান সমাজের উপরিকাঠামোর মধ্যে – আচার, রুচি, নীতি, ফর্মের মধ্যে– খাদ হয়ে মিশে আছে। তা সত্ত্বেও যারা বলছেন, ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতিতে আজও সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক রয়েছে, তর্কের খাতিরে যদি তাদের কথা মেনেও নিই তাহলেও একথা কি সত্য যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষমতাটি ভারতবর্ষের বুর্জোয়াশ্রেণি পরিচালনা করছে এবং আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী দুনিয়ায় যে চরম সঙ্কট চলছে সেই সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় তার প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে তারা ভারতবর্ষের পুঁজিবাদকেই সংহত করার চেষ্টা করছে? যদি তাই হয়, তাহলে একথা তাদের মানতেই হবে যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রটি নিঃসন্দেহে একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং এখানে ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াশ্রেণিকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে সর্বহারা শ্রেণি কর্তৃক ক্ষমতা দখলই বিপ্লবের প্রধান কার্যক্রম – অর্থাৎ ভারতবর্ষের বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

এ প্রসঙ্গে লেনিনের একটা বিখ্যাত উক্তি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই। একসময়ে কাউটস্কির সঙ্গে – কাউটস্কি তখনও 'রেনিগেড' হয়নি – রোজা লুক্সেমবুর্গ জাতীয় রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণের প্রশ্নে একটা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। রোজার বক্তব্য ছিল, যেসব দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন, অথচ আর্থিক দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বা বিদেশি পুঁজিবাদী দেশগুলোর পদানত, সেইসব দেশগুলোকে স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্র বা জাতীয় রাষ্ট্র বা সেইসব দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র বলা যায় না। কাউটস্কি বলেছিলেন – না, এইসব রাষ্ট্রগুলির চরিত্রও স্বাধীন জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রের চরিত্র। রোজা তাঁর উপরোক্ত ধারণার ভিত্তিতে বলেছিলেন – না, ওটা নামে স্বাধীনতা। ফলে ঐসব দেশের জনসাধারণের মূল লড়াইটা পরিচালনা করতে হবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং তাদের সহযোগী যে বুর্জোয়ারা তাদের দেশে রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে – ঠিক যেমন করে আমাদের দেশের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতারা বলছেন। লেনিন তার উত্তরে বলেছিলেন, অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির দাসত্ব থাকার জন্য যাঁরা মনে করছেন, এগুলো স্বাধীন জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্র নয়, তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী যুগটাকেই ধরতে পারেননি। তাঁরা ধরতেই পারেননি, সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের বর্তমান যুগে এমন ঘটনা আকছার ঘটবে। পুঁজিবাদের অসম বিকাশের জন্য কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশ যারা অনেক এগিয়ে গিয়েছে এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ার মধ্যমণি হিসাবে বিরাজ করছে, যারা সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি – এযুগে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সকল দেশের বুর্জোয়ারাই পুঁজিবাদী অর্থনীতির দিক থেকে তাদের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য। তাই তিনি বললেন যে, শুধু ছোট ছোট বলকান রাষ্ট্রগুলোই নয়, এতবড় যে 'জারিস্ট' রাশিয়া, যার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে, তারও অর্থনীতিতে রয়েছে ধনী ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রবল প্রভাব। সেখানে যে পুঁজিবাদ গড়ে উঠল তার ওপরে রয়েছে পশ্চিমী পুঁজিপতিদের প্রবল দাপট। তার জন্য জারিস্ট রাশিয়াকে তো কেউ আর সাম্রাজ্যবাদের কলোনি বলে মনে করে না, বরং সে নিজেই তো এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদ চালু করে বসে আছে।

... সকলেই জানেন 'ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে'র মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় বুর্জোয়া কেরেনস্কি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও সেখানে প্রতিরক্ষা দপ্তর ছিল জারের পরিবারের হাতে। আর রাশিয়ায় যে তখনও সামন্ততন্ত্র প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল সে তো ইতিহাসের অ, আ, ক, খ জ্ঞান যাঁদের আছে তাঁরাই জানেন। এই সামন্তপ্রভুরা – 'ক্যাডেট'দের সঙ্গে যাদের মিত্রতা ছিল– নভেম্বর বিপ্লব পর্যন্ত পুরো সময় ধরে বারবার বলশেভিকদের সঙ্গে লড়ালড়িতে এসেছে। তার জন্য লেনিন 'এপ্রিল থিসিসে' রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে কি একথা বলেছিলেন যে, এটা বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত বুর্জোয়া-জার সরকার? কেন বলেননি? কারণ একটা সোজা কথা যে, রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে রয়েছে বুর্জোরাই।

... তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রশক্তি পুরনো শ্রেণি অর্থাৎ নিকোলাই জারের হাত থেকে একটি নতুন শ্রেণি অর্থাৎ রাশিয়ার বুর্জোয়াশ্রেণির হাতে চলে গিয়েছে। তাহলে কী দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রশক্তি কোন শ্রেণির হাতে রয়েছে, বিপ্লবের স্তর নির্ণয়ে এটাই মূল বিচার্য বিষয়।

... এদিক থেকে যদি আমরা বিচার করি, ভারতবর্ষে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর, বুর্জোয়াশ্রেণি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর কৃষি উৎপাদনের চরিত্র এবং ভূমি সম্পর্কের বর্তমান রূপ যা দাঁড়িয়েছে তা ভালোভাবে না বুঝলেও ভারতবর্ষের রাষ্ট্র যে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদকেই সংহত করার চেষ্টা করছে, শুধু এইটুকু বুঝলেই বোঝা যাবে যে, এটা একটা জাতীয় রাষ্ট্র। আর মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পরিভাষায় জাতীয় রাষ্ট্র মানে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র নয় – তা বুর্জোয়া রাষ্ট্র। আর বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্র লেনিনের পরিভাষায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। তাহলে সেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র উচ্ছেদের বিপ্লব বুর্জোয়াশ্রেণিকে ক্ষমতাচ্যুত করার বিপ্লব এবং সেই অর্থে 'টু দ্যাট এক্সটেন্ট' ভারতবর্ষের বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ...

[১৯৭৪ সালের ৮ নভেম্বর কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রদত্ত ভাষণটি 'মহান নভেম্বর বিপ্লবের পতাকাতলে' শিরোণামে 'শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলী' ৩য় খণ্ডে সংকলিত হয়। ওই রচনার অংশ বিশেষ এখানে প্রকাশ করা হল।]

জেলায় জেলায় রুশ বিপ্লব বার্ষিকী ও পার্টি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন

সিলেট

মহান রুশ বিপ্লবের ৯৮তম বার্ষিকী ও পার্টির ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বাসদ (মার্কসবাদী) সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে ৭ নভেম্বর বিকাল ৩টায় সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের সিলেট জেলা আহ্বায়ক কমরেড উজ্জ্বল রায়ের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী।

ময়মনসিংহ

রুশ বিপ্লব বার্ষিকী ও পার্টি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহ জেলা শাখার উদ্যোগে ১০ নভেম্বর বিকাল ৫টায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সমন্বয়ক শেখর রায়-এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। আরও বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট কিশোরগঞ্জ জেলার সংগঠক আলাল মিয়া, বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্র ময়মনসিংহ জেলার আহ্বায়ক সেঁজুতি চৌধুরী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কিশোরগঞ্জ জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহমিদ আহমেদ ও বাকৃবি শাখার সভাপতি আশরাফ মিল্টন। আলোচনা সভা শেষে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিবেশনায় নাটক 'লাশের দেশ' মঞ্চস্থ হয়। সবশেষে সর্বহারার আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

চট্টগ্রাম

২০ নভেম্বর বিকাল সাড়ে ৩টায় চট্টগ্রাম শহীদ মিনারে বাসদ (মার্কসবাদী) চট্টগ্রাম জেলা শাখা আয়োজিত সমাবেশে মূল বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাসদ (মার্কসবাদী) চট্টগ্রাম জেলা কমিটির আহবায়ক মানস নন্দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য সচিব অপু দাশ গুপ্ত ও সদস্য শফিউদ্দীন কবির আবিদ। সমাবেশের পরবর্তীতে বিভিন্ন দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড ও লাল পতাকা সজ্জিত একটি মিছিল নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

রংপুর

বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ৯ নভেম্বর বিকাল ৪টায় স্থানীয় পায়রা চত্বরে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের রংপুর জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। জনসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনজুর আলম মিঠু, পলাশ কান্তি নাগ। এর আগে ব্যানার-ফেস্টুন ও লাল পতাকা সম্বলিত একটি বর্ণাঢ্য ও সুসজ্জিত র‍্যালি নগরীর প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

নোয়াখালী

বাসদ (মার্কসবাদী) নোয়াখালী জেলা শাখার উদ্যোগে ৯ নভেম্বর সকাল ১১টায় মাইজদীর প্রধান সড়কে দাবি সম্বলিত ব্যানার ফেস্টুন সজ্জিত বর্ণাঢ্য মিছিল করা হয়। মিছিলের পর টাউন হলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাসদ (মার্কসবাদী)'র জেলা কমিটির আহবায়ক দলিলের রহমান দুলাল। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড মানস নন্দী, জেলা ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা তারকেশ্বর দেবনাথ নান্টু, জেলা কমিটির সদস্য বিটুল তালুকদার প্রমুখ।

গাইবান্ধা

৮ নভেম্বর বিকাল ৩টায় গাইবান্ধা পৌর শহীদ মিনার চত্বরে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। মনজুর আলম মিঠুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, জেলা আহ্বায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, কাজী আবু রাহেন শফিউল্যাহ খোকন, গিদারী ইউপি চেয়ারম্যান প্রভাষক গোলাম ছাদেক লেবু, অধ্যাপক রোকেয়া খাতুন, নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, বীরেন চন্দ্র শীল।

ঢাকা

মহান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৯৮তম বার্ষিকী ও ৩৫তম পার্টি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাসদ (মার্কসবাদী) ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ১৩ নভেম্বর শুক্রবার বিকাল ৪টায় পুরানা পল্টনস্থ শহীদ তাজুল মিলনায়তন-এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহানগর সংগঠক ফখরুদ্দিন কবির আতিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মূল বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী)'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। আরো বক্তব্য রাখেন পার্টির কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য জননেতা কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, উজ্জ্বল রায়, সাইফুজ্জামান সাকন। সভা শুরুর আগে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গণসঙ্গীত পরিবেশন করে। শেষে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভা সমাপ্ত হয়।

হবিগঞ্জ

বাসদ (মার্কসবাদী) হবিগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে ১৮ নভেম্বর বিকাল ৩টায় কালীবাড়ি আর.ডি হলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। হবিগঞ্জ জেলা শাখার সংগঠক শফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় আলোচনা করেন হবিগঞ্জ জেলা আইনজীবি সমিতির সহ-সভাপতি এড. মুরলী ধর দাস, বাসদ (মার্কসবাদী) সিলেট জেলা নেতা সুশান্ত সিন্‌হা, সুমন প্রমুখ।

জয়পুরহাট

জয়পুরহাট জেলার উদ্যোগে ১১ নভেম্বর বিকাল ৩টায় কেন্দ্রীয় মসজিদ চত্বরে উন্মুক্ত মঞ্চে জনসভার আয়োজন করা হয়। ওবায়দুল্লাহ মুসার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, শাহ জামাল তালুকদার, তাজিউল ইসলাম।

বগুড়া

বগুড়া জেলার উদ্যোগে ২৫ নভেম্বর বিকাল ৩টায় সাতমাথায় সমাবেশের আয়োজন করা হয়। শামসুল আলম দুলুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পার্টি কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, ওবায়দুল্লাহ মুসা, আহসানুল হাবীব সাঈদ, রনজন দে, আমিনুল ইসলাম, শীতল সাহা।

রাজশাহী

গত ১৫ নভেম্বর রাজশাহী জেলা শাখার উদ্যোগে ভবানীগঞ্জ বাজারে বিকাল ৩টায় এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সংগঠক আতিকুর রহমান। বক্তব্য রাখেন পার্টি কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য ওবায়দুল্লাহ মুসা, মাসুদ রানা, ফজলে রাব্বী।

কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রাম জেলা পার্টির উদ্যোগে ১০ নভেম্বর জনসভার আয়োজন করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য শুভ্রাশু চক্রবর্তী, মনজুর আলম মিঠু, আবদুর রাজ্জাক, জিয়াউদ্দিন, মনিরুজ্জামান ছক্কু, স্বপন রায়। সভাপতিত্ব করেন জেলা পার্টি সংগঠক মহির উদ্দিন।

দিনাজপুর

খানসামায় ২১ নভেম্বর জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। রেজাউল ইসলাম সবুজের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পার্টি কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য মানস নন্দী, আহসানুল হাবীব সাঈদ, কৈলাস, মনিরুজ্জামান।

নীলফামারী

নীলফামারীর ডোমার উপজেলার বাজারে ৯ নভেম্বর সমাবেশের আয়োজন করা হয়। রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পার্টি কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য মানস নন্দী, আহসানুল হাবীব সাঈদ, রাজীব আদনান।

চাঁদপুর

২৫ নভেম্বর চাঁদপুরের শহীদ মিনারে সকাল ১১টায় জনসভার আয়োজন করা হয়। আলমগীর হোসেন দুলালের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পার্টি কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য মানস নন্দী, শীতল ঘোষ, আজিজুর রহমান।

গাজীপুর

গাজীপুরের জয়দেবপুর মুক্তমঞ্চে ১৩ নভেম্বর বিকাল ৩টায় জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন মানস নন্দী, মশিউর রহমান, তরুণ কান্তি বর্মণ, নাইস।

যশোর

২৭ নভেম্বর বিকাল ৩টায় যশোর নাট্যমঞ্চে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। জেলা সমন্বয়ক হাসিনুর রহমানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পার্টি কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য উজ্জ্বল রায়, দীলিপ ঘোষ, রিপন আহমেদ, উজ্জ্বল বিশ্বাস।

রুনা আক্তার হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

রাজধানীর মতিঝিল এজিবি কলোনীর সামনের রাস্তায় সরকারি কর্মচারী রুনা আক্তার হত্যাকারী আল আমিনসহ বখাটেদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে নারীমুক্তি কেন্দ্র ও ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে ২৪ অক্টোবর বিকাল ৪টায় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন নারীমুক্তি কেন্দ্র ঢাকা নগর শাখার সহ সভাপতি মর্জিনা খাতুন এবং সভা পরিচালনা করেন ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক শরিফুল চৌধুরী। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নারীমুক্তি কেন্দ্র'র কেন্দ্রীয় সভাপতি সীমা দত্ত, ঢাকা নগর শাখার সভাপতি এড. সুলতানা আক্তার রুবি, নাঈমা খালেদ মনিকা, মাসুদ রানা। আরো বক্তব্য রাখেন নিহত রুনা আক্তারের বাবা মো. সোবহান ও বোন তানিয়া আক্তার।

উল্লেখ্য, গত ১৬ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যায় বখাটেদের মটর বাইকের চাপায় নিহত হন রুনা আক্তার। মটরবাইকে ওড়না পেঁচিয়ে রাস্তার ওপর টেনে হিঁচড়ে নিয়ে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর মাত্র একজন আসামী আল আমিন গ্রেফতার হলেও অন্যান্য আসামী এখনও গ্রেফতার হয়নি। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানান।

রুনার বাবা মো: সোবহান ও বোন তানিয়া আক্তার হত্যাকারী আল আমিনসহ বখাটেদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। তারা বলেন ইতোমধ্যে অপরাধীরা তাদের হুমকি দিচ্ছে। পুলিশও সহযোগিতা করছে না। বরং সরাসরি ঘটনা প্রত্যক্ষ না করেও মতিঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এটা কোনো ভাবেই হত্যাকাণ্ড নয় বলে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন। প্রশাসনের এই ধরনের দায়িত্বহীন বক্তব্য অপরাধীদেরই প্রশ্রয় যোগাবে। রুনার খুনীদের সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে প্রশাসনকে বাধ্য করার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে তারা সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের গাজীপুর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন গাজীপুর জেলা শাখার প্রথম জেলা সম্মেলন গত ৯ অক্টোবর বিকাল ৩টায় গাজীপুর চান্দনা চৌরাস্তায় অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। মশিউর রহমান খোকনের সভাপতিত্বে ও এড. ফরিদা ইয়াসমিন নাইসের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড জহিরুল ইসলাম, গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ দত্ত, স্থানীয় শ্রমিক সংগঠক মনিরুল ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন, শাহজালাল প্রমুখ।

সম্মেলনকে সামনে রেখে ২ অক্টোবর জেলার বিভিন্ন এলাকা ও ট্রেডের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে জহিরুল ইসলামকে সভাপতি ও মশিউর রহমান খোকনকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে প্রথম গাজীপুর জেলা কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনের সমাবেশে জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

কমরেড কৃষ্ণ কমলের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

বাসদ (মার্কসবাদী) বগুড়া জেলা শাখার সাবেক সমন্বয়ক কমরেড কৃষ্ণ কমলের ১ম মৃত্যুবার্ষিকীতে বাসদ (মার্কসবাদী) পীরগাছা উপজেলা শাখার উদ্যোগে ২৬ অক্টোবর বিকেল ৫টায় ডাকুয়ার দীঘি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। রঞ্জন বর্মনের সভাপতিত্বে স্মরণ সভায় আলোচনা করেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সদস্য কমরেড মনজুর আলম মিঠু, দলের রংপুর জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, কৃষ্ণ কমলের মেজদাদা শিক্ষক পীযুষ কান্তি বর্মণ, পলাশ কান্তি নাগ, বিপ-ব বর্মণ। স্মরণসভার শুরুতে কমরেড কৃষ্ণ কমলের সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

কমরেড আব্বাস উদ্দিনের জীবনাবসান

বাসদ (মার্কসবাদী) নীলফামারী জেলায় প্রধান সংগঠক কমরেড আব্বাস উদ্দিন গত ২৮ নভেম্বর '১৫ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ করে মৃত্যুবরণ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। যৌবন থেকেই তিনি বামপন্থী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার সার আন্দোলন, কমরেড তন্না রায়নের নেতৃত্বে জমি ও ফসলের আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ২০০৬ সালে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন এবং দলের একজন সংগঠক হিসেবে কাজ শুরু করেন। তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যার আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি পরিবারের সদস্যদেরকেও পার্টির সাথে যুক্ত করেন। ২৯ নভেম্বর তার শেষকৃত্যে শত শত মানুষ অংশগ্রহণ করেন। তার মৃত্যুতে পার্টি একজন সৎ, একনিষ্ঠ ও দরদী কমরেডকে হারাল।

'সুন্দরবন রক্ষা সংহতি দিবস' পালন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) হামিদুল হক, ইয়াসিন মিয়া, বহ্নিশিখা জামালী প্রমুখ। খুলনা, বরিশাল, সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদহ, রাজশাহী, বগুড়া, পিরোজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ফেনী, দিনাজপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রামসহ দেশের ৪৫টির বেশী জেলায় সমাবেশ, র‍্যালি ও মানববন্ধনের মাধ্যমে এই কর্মসূচি পালিত হয়। সংহতি সমাবেশের সভাপতি সাইফুল হক সুন্দরবন রক্ষায় ঢাকায় পরিবেশ অধিদপ্তর অভিমুখে বিক্ষোভ, পদযাত্রা, দেশব্যাপী সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

খাগড়াছড়ি : বাসদ (মার্কসবাদী) খাগড়াছড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে শহরের শাপলা চত্বরে মানববন্ধন করা হয়। মানববন্ধনে অরিন্দম কৃষ্ণ দে-র পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) খাগড়াছড়ি জেলা শাখার আহ্বায়ক জাহেদ আহমেদ টুটুল, শাহাদাত হোসেন, নাজির হোসেন, কবির হোসেন ও কৃষ্টি চাকমা। মানববন্ধন শেষে একটি মিছিল শাপলাচত্বর থেকে শুরু করে ডিসি অফিসের মোড় ঘুরে শাপলা চত্বরে এসে শেষ হয়।

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রসঙ্গে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার সমন্বয়ক সাইফুল হক ও মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, সিদ্দিকুর রহমান, মোশারফ হোসেন নান্নু, জোনায়েদ সাকি, মোশরেফা মিশু, ইয়াসিন মিয়া ও হামিদুল হক গত ২৭ অক্টোবর এক যুক্ত বিবৃতিতে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপুর বক্তব্যকে 'চরম বিভ্রান্তিকর ও সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী ভুল ও অগ্রহণযোগ্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে সুন্দরবন বিপন্নকারী রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের পক্ষে যুক্তি দেবার চেষ্টা করেছেন। কয়লাভিত্তিক এই বিরাট বিদ্যুৎ প্রকল্প যে সুন্দরবন, দক্ষিণাঞ্চলের নদীর পানি, মৎস্য সম্পদ, হাজারো প্রাণ-প্রকৃতি ও জীব বৈচিত্র্যের উপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলবে দেশী-বিদেশি গবেষক, বিশে-ষক, পরিবেশবিদ ও বিভিন্ন সংস্থার গবেষণাতেই তা স্পষ্ট। সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন বিভাগের সমীক্ষাতেও তা বেরিয়ে এসেছে। সরকারি চাপের মুখে পরিবেশ অধিদপ্তর এখন সরকারের চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশ সমীক্ষা রিপোর্ট দিলেও বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়টি পুরোপুরি তারা এড়িয়ে যেতে পারেনি। নেতৃবৃন্দ বলেন বিরাট আপত্তির মুখে রামপালেই কেন এই প্রকল্প নির্মাণ করতে হবে মন্ত্রী এর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ উলে-খ করেন, ভারতীয় কোম্পানি ভারতীয় আইনের কারণে ভারতেই বনাঞ্চলের ২৫ কি.মিটারের মধ্যে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ করতে পারেনি। তারা বলেন প্রকল্পের ধোঁয়া ও বর্জ্য অপসারণে 'সুপার ক্রিটিক্যাল' প্রযুক্তি হিসাবে যা বলা হচ্ছে তা নিতান্তই খোঁড়াযুক্তি। ভারতেই এই ধরনের প্রযুক্তির কোনো কার্যকারীতা দেখা যায়নি। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ অনতিবিলম্বে পরিবেশ বিপর্যয়কারী রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করার আহ্বান জানান। তারা প্রয়োজনে স্বাধীন সমীক্ষা কমিশন গঠনেরও দাবি জানান।

শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী শ্রমিক আন্দোলনকে সকল প্রকার আপোষকামিতা-সুবিধাবাদ পরাস্ত করে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের লক্ষ্যে পরিচালিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শুধু অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন বেশীদূর এগিয়ে নেওয়া যাবে না। কারণ বর্তমান সময়ে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত সংকটকালে মালিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় সরকার ক্রমাগত গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে চলছে। ফলে শ্রম আইন সংশোধন, ট্রেড ইউনিয়ন সংকোচন, ছাঁটাই, নিম্নতম মজুরি ইত্যাদির মাধ্যমে এ আক্রমণ নামিয়ে আনছে। একে মোকাবেলা করতে হলে রাজনীতি সচেতন বিপ্লবী ধারার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

গত ২৯ ও ৩০ অক্টোবর শিশু কল্যাণ পরিষদ মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের ২ দিনব্যাপী কর্মী সম্মেলনে প্রধান আলোচক হিসেবে তিনি বক্তব্য রাখেন। এ সম্মেলনে দেশের জেলা, শিল্পাঞ্চল ও সেক্টরের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নেন। সংগঠনের সভাপতি জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, কমরেড মানস নন্দী। সম্মেলন পরিচালনা করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড উজ্জল রায়। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে মালিকানা নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম জাতীয় মজুরি ১৬০০০ টাকা ও ইপিজেড সহ সর্বক্ষেত্রে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়নের দাবি জানান।

ছাত্র ফ্রন্টের ঢাবি শাখার ১০ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ১০ম সম্মেলন ৩ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ইভা মজুমদার -কে সভাপতি, সুস্মিতা রায় সুস্তি-কে সহ-সভাপতি, সালমান সিদ্দিকী-কে সাধারণ সম্পাদক এবং প্রগতি বর্মণ তমা-কে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১১ সদস্যের বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠিত হয়েছে।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ঢাবি'র সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. সামিনা লুৎফা, বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড ফখরুদ্দিন কবির আতিক এবং সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাশেদ শাহরিয়ার। আলোচনা সভা শেষে একটি সুসজ্জিত র‍্যালি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে।

আলোচনায় ড. সামিনা লুৎফা বলেন, 'সামগ্রিকভাবে দেশের পরিস্থিতি যে জায়গায় গেছে তাতে ব্যক্তিগতভাবে কেউ আজ নিরাপদ থাকতে পারছে না। শুধু নিজেদের কথা ভেবে পাশের মানুষটিকেও রক্ষা করা যাচ্ছে না। চরম অসহিষ্ণুতার যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে তাতে মতভিন্নতা হলে খুন পর্যন্ত করা হচ্ছে। এ অবস্থায় মানুষের মতো বাঁচতে হলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া আমাদের সামনে কোনো বিকল্প পথ নেই।'

রংপুরে কৃষক ফ্রন্টের কমিটি

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট রংপুর জেলা শাখার কমিটি গঠনের লক্ষ্যে ১২ নভেম্বর সকাল ১১টায় বাসদ (মার্কসবাদী) জেলা কার্যালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের জেলা সংগঠক কমরেড আনোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহসানুল হাবীব সাঈদ, পলাশ কান্তি নাগ। সভায় বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষক-ক্ষেতমজুর প্রতিনিধিদের সর্বসম্মত মতামতের ভিত্তিতে আনোয়ার হোসেন বাবলুকে আহবায়ক ও আনোয়ারুল ইসলামকে সদস্য সচিব করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

হারাগাছে বিড়ি শ্রমিক পুনর্বাসন সংগ্রাম কমিটি গঠিত

হারাগাছের সারাই পোদ্দারপাড়া সরকারি প্রাথমিক স্কুল মাঠে বিড়ি শ্রমিকদের এক সভা গত ২২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সভায় আলোচনা করেন বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু এবং ভুক্তভোগী বিড়ি শ্রমিকরা। আনোয়ার হোসেন বাবলু অবিলম্বে বিড়ি শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। বৈঠক শেষে নজরুল ইসলামকে আহবায়ক করে ১২ সদস্যবিশিষ্ট সংগ্রাম কমিটি ঘোষণা করা হয়।

চাঁদপুরে পার্টির নতুন অফিস উদ্বোধন

বাসদ (মার্কসবাদী) চাঁদপুর জেলা শাখার নতুন অফিস উদ্বোধন হয়েছে গত ৪ ডিসেম্বর। জেলা শহরের নতুন বাজারস্থ পৌর মার্কেটের ৪র্থ তলায় অফিসটি নির্মাণে দলের নেতা, কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীগণ অর্থায়ন করেন। শুক্রবার সকালে অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে নতুন অফিসে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড আলমগীর হোসেন দুলালের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন কমরেড মানস নন্দী, কমরেড দলিলুর রহমান দুলাল, কমরেড জসিম উদ্দিন, পার্টি শুভানুধ্যায়ী কমরেড চন্দন পোদ্দার ও এড. আব্দুল্লা আল ফারুক, চাঁদপুর জেলা কমিটির সদস্য এড. শীতল ঘোষ ও এড. বিধু ভূষণ নাথ, ফরিদগঞ্জ উপজেলা কমিটির সদস্য সচিব জিএম বাদশা প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন আজিজুর রহমান।

বাঁধাই শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা (রোজ) কাজের মজুরি ২৫০ টাকার দাবিতে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বাঁধাই শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা (রোজ) কাজের মজুরি ২৫০ টাকার দাবিতে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে ২৭ নভেম্বর '১৫ বিকাল ৪টায় পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ্ পার্কের সামনে থেকে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিছিল শ্যামবাজার, সূত্রাপুর, বাংলাবাজার এলাকা প্রদক্ষিণ করে পুনরায় বাহাদুর শাহ্ পার্কে এসে সমাবেশে মিলিত হয়।

সমাবেশে সূত্রাপুর থানা শাখার সংগঠক রাজীব চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড জহিরুল ইসলাম, মাসুদ রানা, জামিল হোসেন, শাহিদুল ইসলাম প্রমুখ। সমাবেশ পরিচালনা করেন বাঁধাই শ্রমিক সংগঠক মানিক হোসেন।

সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদই মানবমুক্তির পথ

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর) পিছানোটা বড় সমস্যা নয়। বিচার করে দেখতে হবে বিকাশের পথে সমাজতন্ত্র অনিবার্য কি না। সমাজের এক স্তর থেকে অপর স্তরে উন্নীত হওয়ার নিয়ম আছে। সেটি মানুষের চিন্তা-নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করে। বস্তুজগতের (সে প্রাণীর বিকাশই হোক কিংবা সমাজের) বিকাশের ধারাবাহিকতায় মানুষের চেতনার ভূমিকা এই যে, চেতনা বস্তুর বিকাশের সেই নিয়মের উপর ক্রিয়া করে তাকে ত্বরান্বিত করে, কিন্তু মানুষের চেতনার উপর নির্ভর করে বস্তুজগৎ বিকশিত হয়না। বিকশিত হয় তার নিজস্ব নিয়মের দ্বারা। ফলে সমাজ বিকাশের অনিবার্য নিয়মে সমাজতন্ত্র আসতেই হবে। দেশে দেশে গড়ে ওঠা শ্রেণী সচেতন বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সে পরিণতি পাবে।

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর বিশ্ব পরিস্থিতি

আজকের যুগে অর্থাৎ লেনিন বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের এ যুগে বিশ্ব পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার সংকট আগের চেয়ে আরও ব্যাপক, ভয়াবহ ও জটিল রূপ ধারণ করেছে।

১৯১৬ সালে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড লেনিন তাঁর "সাম্রাজ্যবাদ : পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর" বইটিতে দেখিয়েছিলেন, পুঁজিবাদের ঊষালগ্নের অবাধ প্রতিযোগিতার যুগ আর নেই। উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহে মুষ্টিমেয় কিছু পুঁজিপতি কাঁচামাল ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃহৎ অংশ নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিতে পরিণত হয়েছে। এই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা শিল্প পুঁজি ও ব্যাংক পুঁজির মিলন ঘটিয়ে লগ্নি পুঁজির জন্ম দিয়েছে ও তা তুলনামূলক সস্তা শ্রমের দেশগুলোতে খাটাচ্ছে। এভাবে পুঁজি রপ্তানি করে অন্য দেশের সস্তা শ্রম ও কাঁচামাল শোষণ করার এই চরিত্রটি ছিল পুঁজিবাদের পূর্বতন বৈশিষ্ট থেকে নতুন এবং লেনিন এর নাম দিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদ। লেনিন বলেছিলেন,এই সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর।এরপর পুঁজিবাদের বিকশিত হওয়ার আর কোনো উপায় নেই। এই সাম্রাজ্যবাদীরা বাজার সংকটে পড়ে বাজার দখলের জন্যই দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের জন্ম দিয়েছে, কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করেছে। কারণ এই প্রক্রিয়ায়ই পুঁজিবাদকে টিকে থাকতে হবে, এ ছাড়া তার আর কোনো পথ নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে কমরেড লেনিন বলেছিলেন : "The war of 1914-18 was imperialist (that is, an annexationist,predatory, war of plunder) on the part of both sides; it was a war for the division of the world, for the partition and repartition of colonies and spheres of influence of finance capital." *(Imperialism: The Highest Stage of Capitalism)*

আজকের এই সময়ে সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগবৈশিষ্ট্য এক থাকা সত্ত্বেও তার মাত্রা আজ একই রকম নেই। লেনিনের সময় থেকে তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সংকট আরও প্রকট হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সব রকম সংকট সত্ত্বেও পুঁজিবাদের যে আপেক্ষিক স্থায়ীত্ব ছিল তা আজ আর নেই। সে এখন প্রতি মুহূর্তে সংকটে পড়ছে, তা থেকে বাঁচার জন্য সে যে রাস্তা বেছে নিচ্ছে তা তাকে আরও গভীর সংকটে নিমজ্জিত করছে। এককথায় পুঁজিবাদের সংকট আজ এবেলা ওবেলার সংকটে পরিণত হয়েছে।

সংকট থেকে বাঁচার জন্য পুঁজিবাদ দেশে দেশে অর্থনীতির সামরিকীকরণ ঘটাচ্ছে। অর্থাৎ সমস্তশিল্প যখন মন্দায় ডুবছে তখন ব্যাপক পরিমাণে সামরিক শিল্পের প্রসার ঘটাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের এই প্রবণতাটি ব্যাখ্যা করে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, "শিল্পের সামরিকীকরণ বলতে বোঝায়, সরকার যেখানে নিজেই অর্ডার দেয়, আবার সেই মাল সরকার নিজেই কেনে। উৎপাদিত মাল বিক্রির জন্য বাজারের উপর, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হয় না। শুধু সামরিক খাতে সরকারের বাজেট বাড়তে থাকে। ফলে, মন্দা – অর্থাৎ, যাকে আমরা বলি বাজার নেই, কাজকর্ম নেই, অর্ডার নেই – এই সমস্যার হাত থেকে সাময়িকভাবে হলেও শিল্পগুলো বাঁচে। অবস্থাটা দাঁড়ায় এইরকম যে, সরকার নিজেই 'প্লেন' তৈরি করার, 'ফাইটার' তৈরি করার এবং নানা সামরিক সরঞ্জাম তৈরি করার অর্ডার দেয়, আবার এই তৈরি মালগুলো সরকারই কেনে। ফলে, বাজারের উপর বা লোকের ক্রয়ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হয়না বলে সাময়িকভাবে 'রিসেশন' বা বাজার-মন্দার চাপ থেকে অর্থনীতিকে কিছুটা পরিমাণে রক্ষা করা সম্ভব হয়। কিন্তু, এই পরিকল্পনার আবার একটা কনট্রাডিকশন বা উল্টোদিক আছে। তা হলো এই যে, যত মাল বা অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হতে থাকবে সেগুলি যদি বসে থাকে, অর্থাৎ সেগুলি যদি খালাস করা না যায়, তাহলে মাল ক্রমাগত জমতে থাকার ফলে অর্থনীতিতে বন্ধ্যাত্বের ঝোঁক (টেনডেনসি অব স্ট্যাগনেশন) এর জন্ম হবে এবং এর ফলে সামরিক শিল্পেও আবার লালবাতি জ্বলতে শুরু করবে। অথচ সরকার বিনা প্রয়োজনে এই মালগুলো কিনে গুদামজাত করতে পারে না। কাজেই এই মাল খালাস করার প্রয়োজনেই তাদের চাই স্থানীয় ও আংশিক যুদ্ধ।"

তাই আজ দেখা যায়, অর্থনীতির সামরিকীকরণই সকল বড় বড় পুঁজিবাদী দেশের বেঁচে থাকার একমাত্র পথ। আমেরিকার দিকে তাকিয়ে দেখুন, আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে বড় পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশ। বিশ্বের মোট জিডিপির ২২ শতাংশের যোগানদাতা হলো আমেরিকা। কিন্তু এ দিয়ে আমেরিকার অর্থনীতিকে বোঝা যাবেনা। ঐ বিশাল অর্থনীতি আজ কাঁপছে। আমেরিকার অর্থনীতির আকার ১৭.৮৪১ ট্রিলিয়ন ডলার। আর তার ঋণের পরিমাণ ১৮.১ ট্রিলিয়ন ডলার। আজ আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে ঋণগ্রস্ত জাতি। অথচ সে বাহ্যিকভাবে মহাশক্তি নিয়ে আছে। সেটি অস্ত্র উৎপাদনের মধ্য দিয়ে গায়ের জোরে অন্য দেশের উপর হামলা করে। বাস্তবে তার গোটা অর্থনীতিই যুদ্ধ অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। সে চোরাবালির উপর দাঁড়ানো। যে কোনো সময় ধসে পড়লো বলে।

আমেরিকার ১৬টির বেশি গোয়েন্দা সংস্থা আছে দেশে-বিদেশে গোয়েন্দা তৎপরতা চালানোর জন্য। যেখানে এক লক্ষ সাত হাজারেরও বেশি লোক কাজ করে। সম্প্রতি কাউন্টার টেররিজম সিস্টেমে নতুন করে দশ হাজার লোক নেয়া হয়েছে। এরা হলো আর্মি ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির বাইরের লোক। আর্মি ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিতে দশ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়। এগুলো হলো গোটা ডিফেন্স সিস্টেমে সরাসরি যুক্তদের একটি গড় হিসাব। তাও যে সকল তথ্য প্রকাশিত, সেগুলো অনুসারে। এর সাথে যুক্ত হবে এই বিরাট অস্ত্র উৎপাদনের সাথে সহযোগী শিল্প ও ব্যবসাসমূহ। সেখানে যুক্ত আরও লক্ষ লক্ষ লোক। ডিফেন্স বাজেট কমানোর কথা কংগ্রেসে এক সদস্য বলেছিলেন। কয়েকজন তাকে সমর্থনও করেছিলেন। অস্ত্র কোম্পানির মালিকেরা তাতেই চোখ রাঙ্গিয়ে বললেন, তাহলে আমেরিকায় এক ধাক্কায় মিলিয়ন মিলিয়ন লোক বেকার হয়ে যাবে। এই হলো আমেরিকার শিল্পোন্নতির নমুনা।

আমরা আগেই বলেছি, অস্ত্র উৎপাদন চালু রাখতে হলে তাকে খালাসও করতে হবে। এর জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন। আজ আমেরিকা সারা বিশ্বে আংশিক ও খণ্ড যুদ্ধ চালু রেখেছে। আমেরিকা যে সারা দুনিয়া ঘুরে সবার ভালো করতে চায়, সবার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সে যে ছটফট করে, ছুটে যায় – তার আসল রহস্য এখানে। তার অস্ত্র খালাসের প্রয়োজনে সে এর খবর তাকে বলে, ওর খবর একে দেয়, খবর তৈরি করে, খবর বিক্রি করে,এর বিরুদ্ধে তাকে লাগায়। অর্থাৎ যুদ্ধ বা সংঘর্ষ না থাকলে তার অর্থনীতি চোখ বুঁজবে।

তাই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য যার বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ করে তাকেই আবার অস্ত্র সরবরাহ করে। অর্থাৎ এ যুদ্ধ জয়ের জন্য নয়। বিজয়ী হলে যুদ্ধ থেমে যাবে। তাই জয় দরকার নেই, যুদ্ধ দরকার। আই.এস এর ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। আবার রাশিয়া আইএস ঘাঁটিতে হামলা মৌলবাদের হাত থেকে মানবতা রক্ষার জন্য করেনি। একদিকে আসাদের পতন ঘটলে ও সিরিয়ায় মার্কিন আধিপত্য তৈরি হলে রাশিয়ার জন্য ভীষণ সমস্যা, আবার তার অস্ত্রও খালাস হওয়া দরকার। আমেরিকার পরে সে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম অস্ত্র ব্যবসায়ী দেশ। আমেরিকা বিশ্বের অস্ত্র রপ্তানীর ৩১ শতাংশের যোগানদাতা, রাশিয়া ২৭ শতাংশের। তাই তারও যুদ্ধ দরকার।

গোটা দুনিয়ায় যখন যাকে দরকার তাকেই আক্রমণ করছে আমেরিকা ও ন্যাটো জোট, যেখানে আছে বড় বড় পুঁজিবাদী দেশসমূহ। তার জন্য কোনো কারণ দেখানোর দরকার নেই। পত্রিকায় একটা কিছু বললেই হলো। তার ঠিক-বেঠিকেরও ব্যাপার নেই। ভুল অভিযোগ তুলে ইরাক আক্রমণ করে গোটা ইরাককে তছনছ করে দেয়া হলো। আজ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার স্বীকার করছেন, সেটি ভুল ছিল। তাহলে কেন আক্রমণ করা হলো? কারণ আক্রমণ না হলে, যুদ্ধ না হলে তাদের অর্থনীতি বাঁচবেনা।

প্রায় সকল পুঁজিবাদী দেশই ঋণগ্রস্ত, উৎপাদন বন্ধ, বেকার বাড়ছে

এ দশা সারা বিশ্বের সকল বড় বড় পুঁজিবাদী দেশের। গণতন্ত্রের সূতিকাগার ফ্রান্সের জাতীয় ঋণ তার মোট জিডিপির ৯৩.৫%, ব্রিটেনের ৯০.৬%, জার্মানির ৭৮.৪%। পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার কালে এরাই বিশ্বকে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। গ্রিস দেউলিয়া। সেদেশের কর্মক্ষম যুবকদের অর্ধেকই আজ বেকার। ব্রিটেনে বেকারের সংখ্যা ১.৮৫ মিলিয়ন, জার্মানিতে ২.৭২ মিলিয়ন। গত দশ বছরে আমেরিকায় কাজ হারিয়েছে প্রায় ১২ মিলিয়ন লোক। এই হলো পুঁজিবাদী উন্নতির নমুনা। সমস্ত উৎপাদন খাত বন্ধ পড়ে আছে এসব দেশে। পুঁজি খাটছে সার্ভিস সেক্টরে, সুদ ব্যবসায় অর্থাৎশেয়ার বাজার, গরিব দেশকে ঋণ দেয়া-সুদ নেয়া কিংবা মাইক্রোক্রেডিটে। আর এখন সব চেয়ে বড় খাত হলো অস্ত্র উৎপাদন।

গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে কবর বানানো হয়েছে আমেরিকার অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনেই

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত যাদের কষ্ট দেয় তারা যদি এর পেছনে ঐ সব বিশেষ বিশেষ সংঘাতের বিশেষ কারণ খুঁজতে যান তাহলে কিছুতেই সমাধানে আসতে পারবেন না। এই পুরো যুদ্ধকাণ্ডে বিশ্ব অর্থনীতির সংশ্লিষ্টতা কী এবং কী কারণে এসব হয়, সঠিক বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই তা বুঝতে হবে। পূর্বের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ লাগিয়ে অস্ত্র বিক্রি করা, পাশাপাশি তার তেল সম্পদ লুট করার জন্য আমেরিকা এই অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। এখানে তার আরেক সহযোগী ইসরায়েল। ইসরায়েল দফায় দফায় ফিলিস্তিনে হামলা চালাচ্ছে। সম্প্রতি ২০১৪ সালের ৭ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত টানা ইসরায়েলি হামলায় ১৪৬২ জন সাধারণ নাগরিকসহ মোট ২২৪১ জন নিহত হয়েছে। ইসরায়েলের অস্ত্র যোগান দিচ্ছে আমেরিকা। ২০১৫ সালের মে মাসে সে ইসরায়েলের কাছে ১.৯ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করেছে। সৌদি আরব হুথিদের দমনের নামে ইয়েমেনে যে আগ্রাসন চালাচ্ছে সেজন্য অস্ত্র কিনছে আমেরিকার কাছ থেকে। এরই মধ্যে আমেরিকা ৮০ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করছে সৌদি আরবের কাছে।

আবার আইএস-এর বিরুদ্ধে আমেরিকা সবাইকে সাথে নিয়ে যুদ্ধের ডাক দিলেও সে নিজেই আইএস-এর কাছে অস্ত্র বিক্রি করেছে। ইরাকি সেনারা কয়েকবার আইএস-এর জন্য অস্ত্র নিয়ে যাওয়া আমেরিকান বিমান গুলি করে নামিয়েছে। এখানে মধ্যস্থতা করছে ইসরায়েল। আইএস তেল বিক্রি করে অস্ত্র কিনছে। আর আইএস অধিকৃত তেলক্ষেত্র থেকে বেআইনিভাবে তেলবাহী ট্যাংকারের মাধ্যমে ইসরায়েলের আশকেলন বন্দরে তেল জাহাজে বোঝাই হচ্ছে ও পাচার হচ্ছে।

এই মৌলবাদী শক্তিসমূহকে কে তৈরি করেছে? তাদের অস্ত্র দিয়ে, অর্থ দিয়ে কারা সহযোগিতা করছে? তালেবান ও তারপর আল-কায়েদা তৈরি হয়েছে আমেরিকার প্রত্যক্ষ ভূমিকায়। আইএস আল-কায়েদারই একটি ফ্র্যাকশন। আজ আমেরিকার রাজনীতিবিদদের মুখেই এই কথা শোনা যাচ্ছে। রিপাবলিক দলের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট রিক স্যান্তোরাম বলেছেন, ওবামাই আইএস সৃষ্টির জন্য দায়ী। ওবামা বলেছেন, তিনি নন। দায়ী প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশ। সবাইকে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ বিশেষ করে আমেরিকা অস্ত্র জুগিয়েছে। সম্প্রতি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন অভিযোগ করেছেন, আমেরিকাসহ ইউরোপের অনেকগুলো দেশ (সব মিলিয়ে প্রায় ৪০টি দেশের কথা বলেছে রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা) আইএস-কে সরাসরি অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে, আবার তার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছে।

আরেকটা বিষয় এখানে বলে রাখা ভাল, অস্ত্রের একটা নিজস্ব নিয়ম আছে। কাউকে অস্ত্র দিয়ে অন্য কারও বিরুদ্ধে দাঁড় করালে, কাজ শেষ হবার পর, কোনো বিশেষ বিষয়ে যখন অস্ত্রদাতার সাথে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, তখন সে অস্ত্রদাতার বিরুদ্ধেই সেই অস্ত্র ব্যবহার করে। তালেবান, আল-কায়েদা এরা আমেরিকার ক্ষেত্রে তাই করেছে।

কিন্তু এই শেষ নয়, নাইজেরিয়ার জঙ্গীগোষ্ঠী 'বোকো হারাম'কে অস্ত্র দিচ্ছে আমেরিকা – এই অভিযোগ খোদ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে করেছেন নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বুহারি।সিরিয়ায় আসাদ বিরোধী 'ফ্রি সিরিয়ান আর্মি'-কে সব রকম সহায়তা দেয়া হচ্ছিল আসাদকে গদি থেকে সরানোর জন্য। ইসরায়েল এদের প্রত্যক্ষভাবে অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা দিয়ে সহায়তা করছে, এমন অভিযোগ করছে খোদ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী। ইসরায়েলের পেছনে আছে আমেরিকা। ২০১৩ সালে আসাদবিরোধী ফ্রি সিরিয়ান আর্মিকে ফ্রান্স অস্ত্র সরবরাহ করতে প্রস্তুত বলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদ। এই 'ফ্রি সিরিয়ান আর্মি' এখন আল নুসরা, হরকত হাজাম প্রভৃতি নামে আইএস-এর হয়ে কাজ করছে। ইদানিং আইএস-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রাশিয়ার সাথে চুক্তি করেছে ফ্রান্স। অর্থাৎ বিশ্বের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অস্ত্র রপ্তানীকারী দুই দেশ এখন সিরিয়ায় অস্ত্র খালাস করতে নামবে আইএস দমনের নামে। ইতিমধ্যে সিরিয়ায় ৪ লক্ষ লোক মারা গেছে। ১০ লক্ষ লোক ঘরছাড়া। ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়ায় মারা গেছে লক্ষ লক্ষ লোক। গোটা মধ্যপ্রাচ্য আজ এক বিরাট কবরস্থান। ইরাক আপেক্ষিক অর্থে একটি অগ্রসর রাষ্ট্র ছিল। লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফী নানা সংঘর্ষে যুক্ত উপজাতি গোষ্ঠীসমূহকে একত্রিত করেছিলেন। আজ ইরাকের কী অবস্থা? গাদ্দাফিকে হত্যা করে লিবিয়ায় কী প্রতিষ্ঠা করা হলো?

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) ২০১৪ সালের এক রিপোর্টে দেখিয়েছে, ২০১৩ সালে আমেরিকার অস্ত্র কোম্পানিগুলোর বিক্রি ২০১২ সালের তুলনায় ৪.৫% কমে যায়, কারণ তখন আমেরিকা ইরাক ও আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করছিল। বিশ্বের শীর্ষ ১০০টি অস্ত্র কোম্পানির মধ্যে ২০১১ সালে আমেরিকার ৪২টি কোম্পানি ছিল, ২০১৩ সালে তা নেমে আসে ৩৮-এ। অর্থাৎ যুদ্ধ বন্ধ মানেই অর্থনীতি স্তব্ধ।

ফলে বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই – কি কারণে যুদ্ধ, কেন সংঘাত, কেন দ্বন্দ্ব, সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ কার লাভের জন্য, কার অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার জন্য। ফলে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দুই'ই টিকিয়ে রাখতে হবে। না হলে পুঁজিবাদ অন্তিম শয্যা নেবে।

মানুষের অপমান-অবমাননাবোধকে কাজে লাগিয়ে ধর্মীয় কূপমণ্ডূক চিন্তা ও উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রসার ঘটাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীরা

যেহেতু মানুষ এই অত্যাচারের শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করার জন্য কোনো দীর্ঘস্থায়ী লড়াই দেখতে পাচ্ছে না, কোনো কিছুই করতে পারছে না, এই কোনো কিছুই করতে না পারা মানুষের মধ্যে এর অপমান-অবমাননাবোধ তীক্ষ্ণ-তীব্র থাকে। মানুষের এই অপমান-অবমাননাবোধকে কাজে লাগিয়ে তাকে বিভক্ত করে রাখার জন্য পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ আজ ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতা ও উগ্র জাতীয়তাবাদকে উস্কে দিচ্ছে। ইউরোপের দেশে দেশে উগ্র জাতীয়তাবাদের হাওয়া বইছে। সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ প্রত্যক্ষ যে জবরদস্তি করছে তা মানুষ বুঝতে পারছে, কিন্তু কীভাবে তাকে মোকাবেলা করবে তাকে বুঝতে না পেরে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনীতির মধ্যে যে এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথ আছে তা ধরতে না পেরে, তার দিশা না পেয়ে, ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার যে উগ্র রূপ তার ভিত্তিতে তারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছে। প্রতিবাদ করার চেষ্টা করছে। এইরকমের অন্ধ শক্তির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিণতিতে তারা পারস্পরিক পার্থক্যকে কেন্দ্র করে হানাহানিও করছে। গোটা বিষয়টাই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। আমেরিকা বোমা মেরে ইরাক ধ্বংস করলো, আফগানিস্তান করলো, লিবিয়া করলো – এইসকল দেশের জনগণের মধ্যে আমেরিকার বিরুদ্ধে যে তীব্র ক্ষোভ-রাগ, যেটা সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রকৃত পথ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী সংগ্রামের পথে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা যেত, তার দিশা না পেয়ে সেই ক্ষোভ-রাগ-ক্রোধ ধর্মীয় কুসংস্কার-কূপমণ্ডূকতার পথেই প্রবাহিত হচ্ছে। এ কারণেই আজকে এই ঘটনাগুলো দেখছি।

তাই মানুষের দুঃখ-কষ্টও সাম্রাজ্যবাদীরা সৃষ্টি করেছে, আবার মানুষের মধ্যকার পার্থক্যকে কেন্দ্র করে একদলকে আরেকদলের বিরুদ্ধে লাগানোর আয়োজনও তারা করছে। সমস্ত কিছুর মধ্যে রয়েছে অস্ত্র বিক্রি, অস্ত্র চলাচল।

আমেরিকার একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে একত্রিত হচ্ছে নতুন বিশ্বশক্তিসমূহ

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বরাজনীতিতে এক নতুন মেরুকরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে আমেরিকার যে একক আধিপত্য সেটা এখন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। রাশিয়া-চীন-ইরান মিলে এক নতুন মেরুকরণ ঘটাচ্ছে। ভারতও একটু একটু করে এতে যুক্ত হচ্ছে।

Purchasing power parity এর ভিত্তিতে বিবেচনা করলে চীনের অর্থনীতি এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড়।যদিও সামগ্রিক অর্থনীতি হিসাব করলে এখনও আমেরিকাই বড়। চীনের গড় প্রবৃদ্ধি ৭.৫% যেখানে আমেরিকার ২.৫%। এভাবে চলতে থাকলে ২০১৯ সালে চীন আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে "ইকোনমিস্ট" ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। চীনের একক অর্থায়নে গঠিত হয়েছে Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) এটি সম্প্রতি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে। আমেরিকান অর্থনীতিতেও চীনের ঋণ এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। আবার রাশিয়া অনেক আগে থেকেই পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোকে নিয়ে অর্থনৈতিক ও সামরিক জোট *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদই মানবমুক্তির পথ

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) গড়ে তুলেছিল। এর মধ্যে আছে Commonwealth of Independent States (CIS), Collective Security Treaty Organisation (CSTO), Eurasian Economic Union (EEU)। এসব করার মধ্য দিয়ে তারা পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত বেশিরভাগ দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চালু করেছিল।

এই রাশিয়া ও চীন মিলে ২০০১ সালে গঠন করে Sanghai Co-operative Organisation(SCO)। প্রথমে রাশিয়া ও চীন বাদে মধ্য এশিয়ার কিছু দেশ ছিল এর সদস্য। তারা আন্তঃরাষ্ট্র অর্থনৈতিক সম্পর্কের পাশাপাশি যৌথ সামরিক মহড়াও চালু করেছে যেটি "পিস মিশন" নামে পরিচিত। সম্প্রতি এই SCO-এর সদস্য হয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। ইরানের পর্যবেক্ষক সদস্য এবং ২০১৬ সালে জাতিসংঘের সহায়তা শেষ হলে সে এর পূর্ণ সদস্য হবে।

আবার ইতিমধ্যে রাশিয়া-চীন-ভারত-ব্রাজিল-দক্ষিণ আফ্রিকা মিলে গঠন করছে BRICS। সম্প্রতি এই জোট একটি ব্যাংক এর জন্ম দিয়েছে New Development Bank (NDB) নামে যার শুরুর পুঁজি ৫০ বিলিয়ন ডলার এবং ক্রমেই তা ৪০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে। AIIB এবং NDB মিলে বিশ্বব্যাংকের একচ্ছত্র ভূমিকা আর থাকতে দিচ্ছে না। ফলে BRICS, NDB, EEU, SCO, AIIB মিলে এক নতুন বার্তা দিচ্ছে যা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক নতুন মেরুকরণ।

চীন বিরাট অর্থনৈতিক শক্তি। রাশিয়াও বিশ্বের বড় পরাশক্তি। ইরান ভূরাজনৈতিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেশ। পারস্য উপসাগরের মধ্য দিয়ে উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহে তার যোগাযোগ, সড়কপথে তার যোগাযোগ মধ্য এশিয়ার দেশসমূহের সাথে। আবার ইরানেরও ইসরায়েল ও সৌদি আরবকে মোকাবেলা করে মধ্যপ্রাচ্যে টিকে থাকার জন্য রাশিয়া ও চীনের সহযোগিতা দরকার।

ভারত একটা মধ্যবর্তী অবস্থানে আছে। আমেরিকা নিজে কোণঠাসা হওয়ার কারণেও আবার ভারত মহাসাগরে নিয়ন্ত্রণ রক্ষার জন্যেও ভারতকে হাতছাড়া করতে চায় না। গত জুন মাসে আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তার প্রতীক হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে। ভারত এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমেরিকার বাজারে সুবিধা নিতে চায়। চীন ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন একটি দেশ। চীনের সাথে আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্নে, বাজার দখল ও বাণিজ্যের প্রশ্নে তার দ্বন্দ্ব আছে। আবার রাশিয়া-চীনের সাথেও সে সম্পর্ক রেখে চলেছে। কারণ ইউরেশিয়ান অর্থনৈতিক ইউনিয়ন বিস্তৃত হচ্ছে। ভারত,ইরান, ভিয়েতনাম, মিশর ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহ – আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে ইত্যাদিতে EEU বিস্তৃত হচ্ছে। ফলে একদিকে ইউরেশিয়ান অঞ্চল, তার সাথে চীন ও এই সমস্ত দেশগুলো মিলে যে বিরাট অর্থনৈতিক মুক্ত অঞ্চল গঠিত হতে যাচ্ছে – এর অংশীদার হওয়ার সুযোগ ভারত হাতছাড়া করতে চায় না। আবার তুর্কেমেনিস্তান-আফগানিস্তান-পাকিস্তান-ভারত গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের যে পরিকল্পনা আছে তা বাস্তবায়িত হলে সেই গ্যাসের ৪২% ভারত পাবে। ফলে ভারতের এ জোটে সম্পর্ক বজায় রেখে চলাই বাস্তবসম্মত। তবে ভারতের চীনকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা সবসময় আছে। ফলে একেবারে চীনের সাথে একত্রিত হওয়ার এখনই কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে আমেরিকা ও রাশিয়া-চীন মেরুকরণের দুদিক থেকে যতটুকু সুবিধা নেয়া যায় সে নেবে।

এদিকে ভারত এক মহাপরিকল্পনার সাথেও যুক্ত হচ্ছে। চীন-রাশিয়া-ইরান-ভারত মিলে এক মহাপরিকল্পনা হচ্ছে চীনের নেতৃত্বে। একদিকে চীন, অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্য মিলে 'One belt, one road' প্যাটার্নের 'সিল্ক রোড' এর মহাপরিকল্পনা নিয়েছে চীন। চীন, ভারত, রাশিয়া ও পাকিস্তানসহ মধ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় ৫০টি দেশ এতে যুক্ত হবে। যুক্ত দেশগুলো আবার আন্তঃসম্পর্কের জন্য এই রোডকেও বিস্তৃত করবে। যেমন ৬০০০ কি.মি দীর্ঘ সিল্ক রোডকে আবার পাকিস্তান-চীন অর্থনৈতিক করিডোর করে পাকিস্তানের দিকে ৩০০০ কি.মি বিস্তৃত করবে চীন। আবার চীন-মায়ানমার-বাংলাদেশ-ভারত করিডোরের মাধ্যমে চীন-ভারত মাল্টিলেন হাইওয়ে তৈরি হবে। এই ভারত, চীন,পাকিস্তান ও গোটা মধ্য এশিয়া এবং ইরান-এই বিরাট অঞ্চলটি সুপার হাইওয়ে, হাইওয়ে, সমুদ্র বন্দর, বিমান বন্দর, স্থল পথ, নৌপথ,আকাশপথ, পাইপলাইন ও ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে এক কমপেক্সে নেটওয়ার্কে যুক্ত হবে।

মূলত মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার তেলক্ষেত্রের বিরাট বাজারই এ নেটওয়ার্ক তৈরির পরিকল্পনার পেছনে আছে। আর আছে বাজার সংকট, বাজার দখলের প্রতিযোগিতা, এক সাম্রাজ্যবাদীর আধিপত্যকে আরেক সাম্রাজ্যবাদীর টেক্কা দেয়ার প্রতিযোগিতা। আবার এই নেটওয়ার্ককেই জনসম্মুখে দেখানো হবে উন্নয়ন বলে, সুযোগ বলে, জনগণের জন্য মানবিক(!) পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সেবা বলে। এই নতুন চিত্রায়নে যাই হোক পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সংকট দূর হবে না, অর্থনীতির সামরিকীকরণ আরও বাড়বে এবং তা আরও যুদ্ধের জন্ম দেবে।

একটি বিশ্বযুদ্ধ হলে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সংকটের সাময়িক সমাধান করতে পারতো। বিপুল পরিমাণ অস্ত্র খালাস করে তার ধ্বংসোন্মুখ অর্থনীতিতে সাময়িক তেজিভাব নিয়ে আসতে পারতো। কিন্তু এই মুহূর্তে তারা তা করতে পারছে না। জাপানি সেনারা মিত্র দেশের নিরাপত্তার প্রয়োজনে যৌথভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে, এই মর্মে জাপানী পার্লামেন্ট যখন তার সংবিধানে সংশোধনী আনলো, তখন জাপানের লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নেমে পড়ে। প্রবল বিরোধিতার ঢেউ তৈরি হয় দেশের ভেতরে। একই পরিস্থিতি ইউরোপেও। দুটো বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ইউরোপের মানুষকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। প্রচণ্ড যুদ্ধবিরোধী মনোভাব ইউরোপে। তাই ইউরোপের এই মুহূর্তে যুদ্ধে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

ফলে এই মুহূর্তে বিশ্বযুদ্ধ লাগানো সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু সংঘাত, সংঘাতময় পরিস্থিতি, যুদ্ধের পরিস্থিতি, যুদ্ধের টেনশন ইত্যাদি তৈরি থাকবেই। না হলে অস্ত্র বিক্রি হবে না। CSTO GLbI NATO এর বিরোধিতা করার মতো শক্তিশালী হয় নি। কিন্তু চীন-রাশিয়া-ইরানকে কেন্দ্র করে যে অর্থনৈতিক জোট দানা বাঁধছে তা অচিরেই যদি সামরিক জোটের দিকে যায় – তখন দুই জোট যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব তৈরী করবে, দুই জোটের শরীকরা নিজ নিজ প্রতিরক্ষার জন্য আরও অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হবে, অর্থনীতির আরও ব্যাপক সামরিকীকরণ ঘটবে।

তবে নতুন বৈশ্বিক মেরুকরণের ব্যাপারে আমাদের এ ব্যাখ্যাটি বেশ কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে আমাদের ধারণা মাত্র। এটা যে ঘটে গেছে এমন নয়। এটা যে পরিবর্তিত হতে পারে না তাও নয়। তবে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহের বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনায় ঘটনাসমূহ এই ধরনের মেরুকরণেরই আভাস দিচ্ছে।

আমাদের দেশের পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে

পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই চরম বন্ধ্যাত্ব মানুষের বিকাশের সবরকম রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। সব দিক থেকে ব্যর্থ এ ব্যবস্থা জবরদস্তি করে টিকিয়ে রাখার জন্য পুঁজিপতিদের আজ্ঞাবহ রাষ্ট্র পরিচালনাকারীরা দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম করছে। নির্বাচনের নাটক সাজিয়ে দ্বিদলীয় গণতন্ত্রের নামে ফ্যাসিবাদ দেশে দেশে অনেক আগে থেকেই কায়েম হয়েছে। ওই নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যতটুকুও বা গণতন্ত্রের চিহ্ন ছিল তাও আজ তারা রাখতে চাইছে না। আমাদের দেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন। জনগণ এখন দর্শকমাত্র। দেশে অবারিত সস্তা শ্রম, হ্রাসকৃত মূল্যে জ্বালানি, ভূমিসহ অবকাঠামো সরকারি উদ্যোগে বরাদ্দ করা, যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে কর মওকুফ – ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো এখানে পুঁজি খাটাতে চায়। দেশীয় বৃহৎ বুর্জোয়ারা তাদের সাথে কোলাবোরেশনে সেই মুনাফার ভাগ পেতে চায়। ইতোমধ্যেই পিএইচপি তার ফ্যাক্টরি চীন থেকে সরিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে এসেছে। স্যামসাংকে চট্টগ্রাম ইপিজেডে ৫০০টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এজন্য দেশে স্থিতিশীল পরিবেশ দরকার। এই বিরাট শ্রমশোষণ যাতে নিরবে হতে পারে, কোনো প্রতিবাদ যাতে ধ্বনিত না হয় – সেজন্য তারা আওয়ামী লীগকেই ক্ষমতায় রাখবে। রাখবে জোর করে, মানুষকে শব্দও করতে দেবে না। গোটা দেশকে তারা কাপুরুষ বানিয়ে দিতে চাইছে।

এই সময়ে টানা ব্লগার-লেখক-প্রকাশকদের হত্যা করা হচ্ছে। একটা ষড়যন্ত্রমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে দেশে। মানুষ এসব ঘটনায় আতঙ্কগ্রস্ত। এসবের মাধ্যমে বাস্তবে মানুষকেই হুমকির মধ্যে রাখা হয়েছে। সরকার নির্বিকার। জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন দমনের জন্য যত কঠোরতা সরকারের পক্ষ থেকে লক্ষ করা যায়, এ ব্যাপারে তার অণু পরিমাণও দেখা যাচ্ছে না।

এসবের সাথে সাথে শাসকগোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে মানুষের নৈতিক বল। প্রতিবাদের শক্তি নষ্ট করার জন্য সুবিধাবাদিতা, ঠকানো, প্রতারণা করা, নীচ প্রবৃত্তিকে উস্কে দেয়াসহ হীন মনোবৃত্তির জন্ম দিয়ে চলেছে প্রতিদিন। যারা সমাজে মত তৈরি করে, জনগণের মধ্যকার সেই শিক্ষিত সচেতন অংশকে তারা বিভিন্ন সুবিধা দিয়ে কিনে নিচ্ছে। যারা বুঝে শুনে তাদের পক্ষে যাবার লোক নয় তাদেরও বিভিন্ন পদ, পুরস্কার দিয়ে, সম্মান দিয়ে সূক্ষ্মভাবে পুঁজিপতিরা তাদের শোষণের পক্ষে মতামত গড়ে তোলার কাজে লাগাচ্ছে। দেশকে যারা দুর্দিনে পথ দেখাবেন বলে মানুষ মনে করে, সেই বুদ্ধিজীবীরা রীতিমত ভাড়া খাটছেন, ফ্যাসিবাদী শাসনকে জায়েজ করার জন্য নানা মিষ্টি যুক্তি মানুষের সামনে হাজির করছেন। যারা এই শিবিরে এখনও সচেতনভাবে যুক্ত হয়ে যাননি, তারা হতাশ। ফলে সমাজে এক চূড়ান্ত নৈতিক সংকট বিরাজ করছে।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের মাধ্যমেই দেশে দেশে সর্বহারাশ্রেণীর ঐক্য গড়ে উঠতে পারে

বিশ্ব পরিস্থিতি আজ সমাজতন্ত্রের অনিবার্যতার কথা ঘোষণা করছে। একদিন পরীক্ষিত সত্য হিসেবে যা এসেছিল, ভেতরের দুর্বলতার কারণে সে পর্যুদস্ত হলেও তার বিপুল সম্ভাবনা এখনও বিদ্যমান। একদিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অবস্থান পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করেছিল। পৃথিবীর বুকে শান্তি স্থাপন করেছিল। আজ সমাজতান্ত্রিক শিবির নেই। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ আজ গোটা পৃথিবীতে স্থানীয় ও আঞ্চলিক যুদ্ধ লাগিয়ে রেখেছে। এখন সারা বিশ্বে শরণার্থীর সংখ্যা ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে বেশি। তাই আজ দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ব্যতিরেকে বিশ্বে শান্তি স্থাপন অসম্ভব। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা যে ভয়াবহ সংকটের জন্ম দিয়েছে এবং প্রতিনিয়ত দিচ্ছে তা থেকে রক্ষা পাওয়ারও আর কোনো উপায় নেই।

কিন্তু সংকট বাড়লেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপ্লব হবে না। প্রতিদিনের বেঁচে থাকার সংকটে জেরবার মানুষ প্রতিদিনই তো বিক্ষুব্ধ হচ্ছে, সহ্য করতে না পেরে একসময় রাস্তায় নামছে, পুলিশের বিরুদ্ধে লড়ছে, গুলি খাচ্ছে – কিন্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। সংকট ফিরে ফিরে আসছে। সাম্প্রতিক ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট ও আরব বসন্তে লক্ষ কোটি মানুষ রাস্তায় নেমেছে। ইউরোপে একের পর এক ধর্মঘট হচ্ছে শ্রমিকদের। কিন্তু সমাধান হলো কোথায়? এত ব্যাপক জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলো শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে কেন? আবার এগুলো গড়ে উঠছেই বা কিভাবে?

স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এত লোক একত্রিত হয়ে বেশ কিছুদিন একসাথে চলতে পারে না। আসলে মানুষের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ-অসন্তোষ সব সময় লাঠির জোরে দমন করা যায় না। এটা পুঁজিপতিরা বোঝে। এ জন্যই এ সকল বিক্ষোভে এনজিওগুলো ঢোকে, নেতৃত্ব দেয়, সেগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা করে। এরা মানুষের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে কথা বলে। সরকারের বিরুদ্ধেও বলে। তথ্য-ঘটনা-বর্ণনা দিয়ে তারা অনেক কথা বলে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে যে সামাজিক ব্যবস্থার কারণে এসকল ঘটনা ঘটছে তা এড়িয়ে যায়। আবার কখনও উপর উপর পুঁজিবাদবিরোধী কথাবার্তাও তারা বলে। কিন্তু পুঁজিবাদবিরোধী কথাটা বললেই শুধু হবে না। পুঁজিবাদবিরোধী শক্তি, যারা পুঁজিবাদকে উৎখাত করবে, সেই শক্তি গড়ে ওঠার সংগ্রাম ব্যতিরেকে পুঁজিবাদবিরোধী কথা কিছু স্লোগান মাত্র, তার কোনো কার্যকারিতা নেই। সেই শক্তি বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্ব ছাড়া কোথাও বিকশিত হতে পারে না। ফলে বিরাট বিরাট আন্দোলনগুলো কালক্রমে হয়ে পড়ছে বিরাট বিরাট ঘটনা, তা কোনো পরিণতিতে যেতে পারছে না। দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে পরিণত হওয়ার মতো সুসংগঠিত রূপ সে পাচ্ছেনা। সেই রূপ পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব ছাড়া পাবেও না। তাই জনগণের যত ক্ষোভ নিয়েই সে আসুক না কেন তা কোনো পরিণতি পাবে না। সিয়াটল থেকে আরব বসন্ত পর্যন্ত খেয়াল করে দেখলে তাই দেখা যাবে।

এ বিষয়গুলো পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার কর্তারা ঠিকই বোঝে। তাই সে নানা ইনডিরেক্ট ফোর্স তৈরি করে যাদের সাথে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও সাম্রাজ্যবাদী ফোর্সসমূহের যোগাযোগ প্রত্যক্ষভাবে বোঝা যায় না। তারা বিভিন্ন ফোরাম তৈরি করেছে, পরিবেশবাদী সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন তৈরি করেছে। ফলশ্রুতিতে মানুষ বারে বারে তাদের তাৎক্ষণিক চেতনা থেকে যে বিক্ষোভ তৈরি করছে তা সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে পরিণত হতে পারছে না।

এ জন্য লাগবে সেই পার্টি, সেই আদর্শ, যার ভিত্তি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং তার আজকের যুগে সবচেয়ে উন্নত রূপ কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। সেই চিন্তাধারাকে ধারণ করেই আজকের যুগে দেশে দেশে দল গড়ে তোলার সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। কারণ একটি সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব ব্যতিরেকে এই সমস্ত আন্দোলন সংগ্রাম লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে গড়ে উঠা বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে দেশে দেশে পুঁজিবাদবিরোধী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে পারলেই আজকের দিনে যথার্থ মুক্তির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

এইরকম পরিস্থিতিতে দেশের অভ্যন্তরে ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ে ও সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তোলার জন্য বাম গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ ও দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার জন্য আমরা আবেদন করছি।

এসএসসি ফরম পূরণে আদায়কৃত অতিরিক্ত ফি ফেরত চট্টগ্রাম ও রংপুরে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) এছাড়া বিভিন্ন স্কুল ছাত্রদের উদ্যোগে স্কুলভিত্তিক মানববন্ধন, প্রধান শিক্ষকের কাছে স্মারকলিপি এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত ৪৭টি স্কুলে ফি নির্ধারণ হয় ৫৪৫৫ ও ৫২৫৫ টাকা। সিটি কর্পোরেশন স্কুল ছাত্রদের উদ্যোগে ১০ নভেম্বর মেয়র বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। ছাত্র ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণে ছাত্র ফ্রন্টের ধারাবাহিক আন্দোলনের এক পর্যায়ে মেয়র বাড়তি ফি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। যে সকল স্কুলগুলো ইতোমধ্যে বাড়তি ফি আদায় করেছে তারাও ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছে। বেসরকারি স্কুলগুলো বাড়তি ফি আদায়ের প্রতিবাদে ১২ নভেম্বর বোর্ড চেয়ারম্যানের বরাবর অভিযোগ পত্র পেশ ও শিক্ষাবোর্ডের সামনে সমাবেশ করা হয়।

রংপুর : ১ নভেম্বর সকাল ১১টায় ছাত্র ফ্রন্ট রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে প্রেসক্লাব চত্বরে সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আহসানুল আরেফিন তিতুর সভাপতিত্বে এবং রোকনুজ্জামান রোকনের পরিচালনায় সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সাহারা ফেরদৌস, আনোয়ার হোসেন বাবলু, মুক্তিযোদ্ধা মোজাফফর হোসেন চাঁদ, প্রজন্ম একাত্তরের সভাপতি দেবদাস ঘোষ দেবু, জনস্বাস্থ্য অধিকার আন্দোলনের বেলাল আহমেদ, অভিভাবক মোস্তাফিজুর রহমান, ছাত্র ইউনিয়নের প্রদীপ রায়, ছাত্র ফেডারেশনের রবিউল ইসলাম রনি, হোজায়ফা সাকওয়ান জেলিড, মনোয়ার হোসেন প্রমুখ। ১৬ নভেম্বর ছাত্র ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ জেলা প্রশাসকের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি স্কুলগুলোকে এসএসসি ফরম পূরণের অতিরিক্ত ফি ফেরতের নির্দেশ দেন। ১৯ নভেম্বর সকাল ১১টায় বিক্ষোভ মিছিল-মানববন্ধন ও সমাবেশের পর জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সমাবেশে জেলা প্রশাসক রাহাত আনোয়ার অতিরিক্ত ফি আদায়কারী স্কুল কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে ফেরত দিতে নোটিশ পাঠানোর ঘোষণা দেন। এছাড়া ছাত্র ফ্রন্ট পীরগাছা উপজেলা শাখার উদ্যোগে ২৮ অক্টোবর মানববন্ধন-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

হত্যাকাণ্ডের দায় সরকারের

(শেষ পৃষ্ঠার পর) দায়িত্বহীনতার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-লেখক-পাঠক-প্রকাশক ও নাগরিকবৃন্দের উদ্যোগে প্রেসক্লাব চত্বরে প্রতিবাদী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আবুল মনসুর, বিশিষ্ট লেখিকা ফেরদৌস আরা আলীম, চুয়েট শিক্ষক রিগ্যান মজুমদার, মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাহফুজুর রহমান, শিক্ষক আমিরুর ইসলাম, প্রকাশক জামাল উদ্দীন, চট্টগ্রাম সৃজনশীল প্রকাশনা সমিতির সভাপতি শাহ আলম নিপু, আইনজীবী মুজিবুল হক, ছাত্র ফেডারেশনের ফরহাদ জামান জনি, সত্যজিত বিশ্বাস, চারণের ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য সোমা, কবি আরণ্যক টিটু, স্বরূপ সুপান্থ, বই পড়ুয়া গ্রুপের হিল্লোল দত্ত।

সমাবেশে অধ্যাপক আবুল মনসুর বলেন, স্বাধীন দেশে এই সময়ের মত চরম নিরাপত্তাহীনতা আর কখনো অনুভব করি নি। ভয় এবং নির্বিকারত্ব কাটিয়ে আমাদের সোচ্চার হতে হবে।

প্রকাশক দীপন হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ

একের পর এক হত্যাকাণ্ডের দায় সরকারকেই নিতে হবে

প্রকাশক দীপন হত্যাকারী ও তিন লেখক-প্রকাশক হত্যাচেষ্টাকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ‘শিক্ষক-শিক্ষার্থী-লেখক-নাগরিকবৃন্দের’ ব্যানারে ২ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকাশক দীপন হত্যাকারী ও তিন লেখক-প্রকাশক হত্যাচেষ্টাকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে ১ নভেম্বর বিকেল ৪টায় তোপখানা রোডে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য মানস নন্দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জহিরুল ইসলাম, ফখ্‌রুদ্দিন কবির আতিক।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, একের পর এক হত্যাকাণ্ডের ঘটনার কোনো বিচার না হওয়ায় খুনিদের এ ধরনের আক্রমণ চলছে। ফলে জনগণের জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নে সরকারের দায়িত্বহীনতা আজ নগ্নভাবে উন্মোচিত হয়েছে। উপরন্তু সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য খুনিদের মদদ দেয়ার সামিল। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, সরকার মুক্তচিন্তা ও মত প্রকাশের বাধা তৈরী করার জন্য নানান অগণতান্ত্রিক আইন জারি করে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সহযোগী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশ্রয় ছাড়া এ ধরনের খুনি চক্র গড়ে উঠতে পারে না। নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমান অবক্ষয়ী বুর্জোয়া ব্যবস্থা ও সরকারের ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন বহাল থাকলে সমাজদেহ থেকে হত্যা-সন্ত্রাসের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা যাবে না। বামপন্থিদের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম জোরদার করেই এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ১ নভেম্বর সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রাশেদ শাহরিয়ার, নাঈমা খালেদ মনিকা ও মাসুদ রানা। একই ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, রংপুর, কারমাইকেল কলেজে মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

১ নভেম্বর বেলা ১২টায় প্রগতিশীল ছাত্রজোট এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

৩ নভেম্বর সকাল সাড়ে ১১টায় বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র ঐক্য ফোরাম, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এবং বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন থেকে বিক্ষোভ মিছিল টিএসসি চত্বর, জাতীয় জাদুঘর ও ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে দীপনসহ সকল হত্যাকাণ্ডের খুনীদের গ্রেফতার ও বিচার করতে ব্যর্থ স্বরাষ্টমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। কুশপুত্তলিকা দাহ শেষে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সৈকত মল্লিক, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর আহ্বায়ক ফয়সাল ফারুক অভিক, ছাত্র ঐক্য ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক শওকত আল ইমরান।

চট্টগ্রাম : লেখক, মুক্তচিন্তার মানুষ ও প্রকাশক হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে এবং বিচারহীনতা ও সরকারের *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ফ্রান্সে সাধারণ মানুষের ওপর হামলায় তীব্র নিন্দা

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এক বিবৃতিতে থিয়েটার হল এবং জাতীয় স্টেডিয়াম সহ ফ্রান্সের ৬টি স্থানে হামলা করে ১৩২ জন সাধারণ মানুষ হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘এ ভয়াবহ হামলা ও হত্যাকাণ্ড গভীর চক্রান্তের অংশ। ফ্রান্সের মতো উন্নত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে অকার্যকর করে এ ধরনের সংঘবদ্ধ সশস্ত্র হামলাকে সাধারণভাবে দেখার সুযোগ নেই। দেশে দেশে উগ্র মৌলবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠির লালনকর্তা যে সাম্রাজ্যবাদ, অতীত অভিজ্ঞতায় এ কথা সবারই কাছে স্পষ্ট।’

তিনি আরো বলেন, ‘আজ পুঁজিবাদের সর্বাত্মক সংকটের যুগে কী উন্নত কী অনুন্নত সমস্ত দেশে ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধিতে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে উঠছে। বেকারত্ব ও কর্মসংকোচন মানুষকে চরম অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিচ্ছে। অস্থির ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ পুঁজিবাদি অর্থনীতি টিকে থাকার মরিয়া চেষ্টায় প্রবল আঘাত হানছে শ্রমজীবী মানুষের উপর। ফলে বেঁচে থাকার তাগিদে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন দানা বেধে উঠছে। দুনিয়ার সকল দেশেই এ ধরনের আন্দোলনে ভীত শাসকগোষ্ঠী চক্রান্তের পথে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চায়। একদিকে বর্ণবাদ-সম্প্রদায়িকতা-উগ্র জাতীয়তাবাদ ইত্যাদির ভাবাবেগে আচ্ছন্ন করা, ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা সংঘটিত করে মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা, অন্যদিকে এ পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে দমন পীড়ন জোরদার করা – এসবই এ ষড়যন্ত্রের অংশ।’ তিনি আমাদের দেশের সকল গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল শক্তি সহ বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষদের এ ধরনের জঘন্য হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে এবং পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ অবসানের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

হোসেনী দালান পরিদর্শন বাম মোর্চা নেতৃবৃন্দের

আশুরার প্রাক্কালে বোমায় আক্রান্ত হোসাইনী দালান ইমামবাড়া ও আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেখতে যেয়ে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বলেছেন, এই মর্মান্তিক ঘটনাকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার কোনো অবকাশ নেই। নেতৃবৃন্দ শিয়া সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিধানসহ ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিশ্চিত করার জন্যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। একই সাথে তারা আহতদের উপযুক্ত চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবারও আহ্বান জানান।

২৫ অক্টোবর সকালে হোসাইনী দালান পরিদর্শনকালে শিয়া নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করে সন্ত্রাসী হামলায় হতাহতদের প্রতি সমবেদনা জানান এবং ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের যাবতীয় অপতৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জোরদার করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন মোর্চার নেতৃবৃন্দ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাম মোর্চার সমন্বয়ক সাইফুল হক, শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, আবদুস সালাম, কামরুল আলম সবুজ, বহ্নিশিখা শিখা জামালী, আকবর খান, মুখলেছুর রহমানসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

ছাত্র ফ্রন্টের আন্দোলনের বিজয়

এসএসসি ফরম পূরণে আদায়কৃত অতিরিক্ত ফি ফেরত চট্টগ্রাম ও রংপুরে

চট্টগ্রাম : সরকারের শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণ নীতির ফলে স্কুল থেকে উচ্চ শিক্ষা সবক্ষেত্রেই ছাত্রদের উপর শিক্ষা ব্যয়ের বোঝা দিন দিন বাড়ছে। প্রতিবছরই এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় স্কুলগুলোতে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা হয় নিয়মবহির্ভূত বাড়তি ফি। এবছর শিক্ষাবোর্ড নির্ধারিত ফি বিজ্ঞান শাখায় ১৪৫৫ এবং মানবিক ও ব্যবসা শাখায় ১৩৫৫ টাকা। বিভিন্ন বেসরকারি ও এমপিওভুক্ত স্কুলগুলো নির্ধারিত ফি’র তোয়াক্কা না করে কোচিং ফি, উন্নয়ন ফি ইত্যাদি নামে-বেনামে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা ফরম পূরণের ফি নির্ধারণ করেছে। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম নগর শাখা এবারের এসএসসি পরীক্ষায় ফরম পূরণের নামে অতিরিক্ত ফি আদায় বন্ধের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। অক্টোবরের ১ম সপ্তাহ থেকে নির্বাচনী পরীক্ষা শুরু হয়। পরীক্ষা চলাকালীন সময় ছাত্র ফ্রন্টের কর্মীরা ছাত্র ও অভিভাবকদের কাছে লিফলেট বিলির মাধ্যমে প্রচারণা শুরু করে এবং পরবর্তীতে ‘ফরম পূরণে কোনো প্রকার বাড়তি ফি আদায় করা যাবে না’ এই দাবিতে ছাত্র ও অভিভাবকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। ১৫ অক্টোবর এই দাবিতে চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। নির্বাচনী পরীক্ষা শেষে ছাত্র ও অভিভাবকদেরকে যুক্ত করে ২৯ অক্টোবর চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। *বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)* কর্তৃক ২২/১, তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.sammobad.org। ই-মেইল: mail@spbm.org